Rokomari.com
লালন শাহ
মতিন রায়হান
210985#
36198#557644-1

লালন শাহ ❋ মতিন রায়হান

ছোটদের
শ্রেষ্ঠ বাঙালি সিরিজ

লালন শাহ

মতিন রায়হান

ছোটদের
বাঙালি সিরিজ

লালন শাহ

মতিন রায়হান

ছোটদের
শ্রেষ্ঠ বাঙালি সিরিজ

লালন শাহ

মতিন রায়হান

Md. Shafiul-
Alam

পড়া শুরু-
12.00 am রাত

Jun. 19, 2025

পড়া শেষ
5.16 Am (রাত)

Jun. 21, 2025

হাতেখড়ি

ছোটদের
শ্রেষ্ঠ বাঙালি সিরিজ

দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১
প্রকাশক ❑ আবু মুসা সরকার
হাতেখড়ি
৩৭ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন ❑ ৭১২১৪৪২

স্বত্ব ❑ প্রকাশকের

বর্ণ বিন্যাস ❑ নির্বাচিতা
৫০ পুরানা পল্টন লাইন ঢাকা ১০০০
মুদ্রণ ❑ গাউছিয়া প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স
৪৫খ রজনী চৌধুরী রোড
গেণ্ডারিয়া ঢাকা ১১০০
ফোন ❑ ৭৪১৩৬৭৪
প্রচ্ছদ ❑ ধ্রুব এষ
মূল্য ❑ ৭০ টাকা

ISBN 984-635-049-X

উৎসর্গ
মরমী কবি লালন শাহ স্মরণে

ভূমিকা

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
বাড়ির কাছে আরশীনগর পড়শী বসত করে।
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি,
নাই কিনারা, নাই তরণী
পারে। ...

এই গানের কথা আর সুরের সঙ্গে সবাই পরিচিত। কে লিখেছেন এই আশ্চর্য সুন্দর গান তা আমাদের অজানা নয়। তিনি হলেন বাউল সম্রাট লালন শাহ। প্রায় আড়াইশো বছর আগে ঝিনাইদহ জেলার হরিশপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর গুরু ছিলেন সিরাজ শাহ।

লালন তাঁর গানের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে বেড়াতেন। ঘরবাড়ি ছেড়ে তিনি বেছে নিয়েছিলেন বাউল জীবন। তিনি নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ মনে করতেন, জাত গোত্র তাঁর কাছে মোটেই বড় ছিল না।

একবার তাঁর পরিচয় জানতে চাওয়া হয়েছিল, তিনি গানের কথায় সেই প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন,

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জাতির কী রূপ দেখলাম না দুই
নজরে।.....

মানুষের দেহ, স্রষ্টা, সৃষ্টি এইসব নিয়ে বেশি গান লিখেছেন লালন।

চিরদিন পুষলাম এক অচিন পাখি
ভেদ পরিচয় দেয় না আমায়
ঐ খেদে ঝুরে আঁখি।....

আবার

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনবেড়ি দিতাম পাখির পায়....

এরকম কত শত গান যে এই সাধক লিখেছেন তার সঠিক হিসেব পাওয়া কঠিন। তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন এখন থেকে ১২০ বছর আগে। এত দীর্ঘ সময় পরও তাঁর গান দারুণ জনপ্রিয়। এখনও লালনের গান শুনলে প্রত্যেক বাঙালির মন পুলকিত হয়।

বাংলাদেশের মাটি মানুষের একান্ত আপন লালন শাহ হচ্ছেন বাউল সঙ্গীতের গুরু। তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে লেখা 'লালন শাহ' বইটি ছোটদের এই মরমী কবি গায়ক সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে।

ইমদাদুল হক মিলন

ছোটদের

শ্রেষ্ঠ বাঙালি সিরিজ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
মাইকেল মধুসূদন দত্ত
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বেগম রোকেয়া
কিশোর কবি সুকান্ত
কবি জীবনানন্দ দাশ
শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক
মওলানা ভাসানী
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
লালন শাহ
হাসন রাজা
ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ
শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর
কামরুল হাসান

এক

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি ক'মনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনবেড়ি দিতাম তার পায়।।

আট কুঠুরী নয় দরজা আটা,
মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা,
তার উপরে সদর কোঠা,
আয়না মহল তায়।।

কপালের ফ্যার নইলে কি আর
পাখিটির এমন ব্যবহার
খাঁচা ভেঙ্গে পাখি আমার
কোন বনে পালায়।।

মন তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর কাঁচা বাঁশে,
কোন দিন খাঁচা পড়বে খসে,
ফকির লালন কেঁদে কয়।।

বিখ্যাত এই গানের যিনি গীতিকার তিনি বাউল সাধক লালন শাহ। বাউল সঙ্গীতের তিনি গুরু। অসম্ভব জনপ্রিয় তাঁর গান। বাংলার সাধারণ মানুষের মুখে মুখে লালনের গান। বিচিত্র তাঁর গানের কথা। তারচে'ও বিচিত্র এই সাধকের জীবন।

বাংলা ১১৭৬ সালের কথা। তখন সারা বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। অনাহারে বহুলোকের মৃত্যু হয় এ সময়। এই দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

নামে পরিচিত। বাংলার তিনভাগের একভাগ মানুষ দুর্ভিক্ষের স্বীকার। খাদ্যের অভাবে মানুষ গাছের বাকল পর্যন্ত খাওয়া শুরু করেছিল। এই দুর্ভিক্ষের ছোবল থেকে রেহাই পায়নি ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু থানার হরিশপুরের মানুষেরা।

গরিব পিতা দরিবুল্লাহ তাঁর দুই ছেলে আলম আর কলমকে নিয়ে খুব কষ্টে দিন কাটাতে লাগলেন। একবেলা খাবার জোটে তো আরেকবেলা জোটে না। এটা সেটা খেয়ে চালিয়ে দেন দিনের পর দিন। ঠিক এই রকম খারাপ অবস্থার মধ্যে ১৭৭২ সালের ১৭ অক্টোবর বাংলা ১১৭৯ সালের ১ কার্তিক দরিবুল্লাহর স্ত্রী আমিনা খাতুনের কোল জুড়ে আসে এক শিশু। সেই শিশুর নাম রাখা হয় লালন। বড় হয়ে তিনি হয়ে ওঠেন বাউল লালন শাহ।

এত অভাব এত কষ্টের পরও নবজাতকের মুখের দিকে তাকিয়ে পিতা মাতা ভুলে যান সব দুঃখের কথা, কষ্টের কথা। দরিবুল্লাহ চেষ্টা করেন তাঁর সন্তানদের মুখের খাবার জোগাড় করতে। কিন্তু চারিদিকে যে অভাব আর অভাব। কী করবেন এই অবস্থায় তিনি? হতাশা আর দুঃখ ভরা মন নিয়ে ঘরে ফিরে আসেন দরিবুল্লাহ।

এর মধ্যে লালনের বয়স বছর খানেক হয়ে গেছে। তাঁর অন্য দুইভাই আলম কলম লালনের চে' অনেক বড়। হলে কী হবে তারাও যে বাবাকে কোনও কাজে সাহায্য করবে এমন কাজও নেই। এভাবেই কেটে যাচ্ছিল লালনদের সংসার। কিন্তু সংসারের যিনি কর্তা মানে লালনের বাবা তিনি সংসারের এ হাল সহ্য করতে পারলেন না। একদিন ভীষণ কষ্ট মনে নিয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। পিতাহারা হলেন আমাদের প্রিয় বাউল কবি লালন শাহ।

পিতার মৃত্যুর পর লালনদের পরিবারে এল করুণ পরিণতি। ছোট ছোট তিনটে ছেলে নিয়ে লালনের বিধবা মা আমিনা খাতুন ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। লালনের বড় ভাই আলম বয়স খুব বেশি নয়। তবুও দুঃখী মার মুখের দিকে তাকিয়ে সংসারের করুণ হাল দেখে চাকরির জন্য চলে গেলেন কলকাতা। আর কলম থাকলেন গ্রামে। তিনি শুরু করলেন

চাষবাস। যা কিছু সামান্য জমিজমা আছে তাই [illegible] লাগলেন। কলকাতা থেকে আলম সামান্য কিছু টাকা পাঠাতে লাগলেন আর কলমের চাষবাসে যা রোজগার হয় তাই দিয়ে অতি কষ্টে চলে যায় লালনদের সংসার।

সংসারের এই দুঃখ দুর্দশার কথা শিশু লালন তখন কিছুই বোঝেন না। হেসে খেলেই কেটে যায় তাঁর জীবন। কিন্তু ভাগ্য যাদের খারাপ তাদের কী আর হেসে খেলে বেশিদিন কাটে! লালনেরও কাটল না।

বয়স তখন পাঁচ কি ছয় হবে এ সময় মারা গেলেন মা। মায়ের মৃত্যুতে খুব কাঁদল লালন। তিনি বুঝে গেলেন আজ তিনি তাঁর প্রিয় মানুষকে হারালেন।

অসহায় জীবনে তাঁর লেখাপড়া হলো না। তিনি হলেন রাখাল। এক পাল গরু নিয়ে ছুটলেন মাঠে। সারাদিন গরু চরিয়ে বেড়ান হলো তাঁর জীবনের কাজ। তখন দেশে মন্বন্তর বা অভাব কেটে গেছে কিন্তু লালনের জীবনের মন্বন্তর কাটেনি।

হরিশপুর গ্রামের পূর্বদিকে বিশাল মাঠ। এই মাঠে লালন গরুর পাল চরাতেন। বালক লালন গরুর পাল ছেড়ে দিয়ে দুপুরের রৌদ্দুরে বাবলা গাছের ছায়ায় গিয়ে বসতেন। এখানে ওঁর সঙ্গে দেখা হতো অন্য রাখালদের। তাদের সঙ্গে তাঁর কথা হত, গল্প হত বহুরকমের। সুখের কথা দুঃখের কথা।

কিন্তু এইসব রাখালদের মধ্যে লালন ছিলেন একটু অন্যরকমের, কেমন যেন ভাবুক প্রকৃতির। সব সময় কীসব ভাবতেন আর গুনগুন করে গাইতেন। মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে গাইতেন। দারুন সুরেলা কণ্ঠের সেই গান ফাঁকা মাঠের অনেকদূর পর্যন্ত পৌঁছে যেত। অন্যসব রাখাল ছুটে আসত। গানের সুরে মুগ্ধ হয়ে শুনতো সেই গান। মাঝে ক্ষেত খামারের কাজ ফেলে বহু জোয়ানবুড়ো লোকজনও চলে আসত লালনের কাছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো এই রাখাল বালকের দিকে। কিন্তু তখন তারা কি জানত এই রাখাল বালকই হবেন একদিন বিখ্যাত মরমী সাধক বাউল সম্রাট লালন শাহ। সবার মুখে মুখে শোনা যাবে তাঁর গান! অথবা

তিনি একদিন গেয়ে উঠবেন—

'আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।।
বাড়ির কাছে আরশী নগর পড়শী বসত করে।।
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি,
নাই কিনারা, নাই তরণী,
পারে।
বাঞ্ছা করি দেখবে তারে
কেমনে সেথা যাই রে।।

কি কব পড়শীর কথা
হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা, নাইরে।
ক্ষণেক থাকে শূন্য ভরে
ক্ষণেক ভাসে নীরে।।

পড়শী যদি আমায় ছুঁতো,
যম যাতনা সকল যেতো, দূরে।
সে আর লালন একখানে রয়
লক্ষ যোজন ফাঁক রে।।

দুই

ইংরেজি ১৭৮৫-৮৬ সালের কথা। ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া এলাকায় জারি, সারি ধুয়োগান, ভাবগান কীর্তন নানা ধরনের গানের আসর বসতো। গ্রামে গ্রামে এইসব গানের দল ছিল। বিভিন্ন উৎসবে বিশেষ করে হিন্দুদের পূজা পার্বণে তো পাঁচ সাতদিন ধরে গানের আসর বসত। দলে দলে পাল্লা হত গানের।

কার্তিক মাস এলেই শুরু হত উৎসবের। চলত মাঘ ফাল্গুন মাস পর্যন্ত। বাঙালির ঘরে তখন থাকত নতুন ফসল। সারাদিন ধান কাটা ফসল তোলার কাজ করে রাতে যে একটু ঘুমোবে তা না করে সবাই যেত গান শুনতে।

কিশোর লালনও যেতেন গান শোনার জন্য। কোথাও গানের অনুষ্ঠান আছে শুনলে তিনি আর ঘরে থাকতে পারতেন না। তা যত দূরের গ্রামেই হোক না কেন, পায়ে হেঁটে বা নৌকায় করে চলে যেতেন গান শুনতে। কোনও কোনও দিন গান শুনে দূরের গ্রাম থেকে আর বাড়ি ফিরতেন না। থেকে যেতেন পরের রাতে আবার শোনার জন্য। এভাবে প্রায়ই তিনি গানের কারণে ঘরে ফিরতেন না। তাঁর গরু চরানোর কাজের কথা মনে থাকত না। বিরক্ত হতেন বড়ভাই আলম। প্রায় বকাবকি করতেন তাঁর এই স্বভাবের জন্য।

একবার তো ভাইয়ের বকাবকিতে রাগ করে এক গেরস্তবাড়িতে কাজ নিলেন। হরিশপুর গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় ইনু কাজির বাড়ি। বড়লোক মানুষ ইনু কাজি। বহু জমি জমা তাঁর। এই বাড়িতে কাজ পেয়ে লালন

ভাবলেন যা হোক ভাইর শাসন থেকে বাঁচা গেল। রাত জেগে গান শুনলে এখন তাঁকে আর কে বারণ করে!

কিন্তু ইনু কাজির বাড়িতে এসেও কয়েকদিন পরে তাঁর কাজের দায়িত্ব পড়ল সেই গরু চরান। ভাললাগে না তাঁর এই রাখালের কাজ। এই কাজে অনেক দায়িত্ব। সাত সকালে গরু নিয়ে মাঠে যাও তারপর সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা রাতে গরুর গোয়ালে খাবার দেয়া। এসব কী আর গান পাগল লালন করতে পারে! শুরু হয় কাজে অনিয়ম। মালিক বকাঝকা করে তাঁকে।

লালন ভাবেন এর চে' তার ভাইয়ের সংসারই ভাল। হাজার হোক ভাইতো! বকুক আর যাই করুক তাঁর কাছেই থাকা ভাল। ফিরে এলেন ভাইয়ের সংসারে।

লালনের ভাই কলম বিয়ে করেছেন। ছেলেমেয়ে হয়েছে। সংসারে খরচ বেড়েছে। একার আয় দিয়ে সংসার চলে না। ছোটভাই লালন যদি একটু আয় রোজগার করে তবে সংসারটা ভালই চলার কথা। অথচ সেই মন তাঁর নেই। শুধু গান আর গান।

লালন তখন রীতিমতো ধুয়োজারি লিখে মঞ্চে গাওয়া শুরু করেছেন। বয়স তখন ১৬/১৭ হবে। এই বয়সে যদি একটু সংসারি না হয় তা হলে কি চলে! কিন্তু সংসারি যে লালন কোনওদিন হতে পারবেন না তা তো কারুর জানা ছিল না।

লালনের ভাই কলম আর ভাবী খুব বিরক্ত হলেন তাঁর প্রতি। তাঁরা তাঁকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বললেন। ভাই ভাবীর মুখে এমন কথা শুনে তিনি খুব কষ্ট পেলেন। ঘর ছাড়লেন লালন, আপন ঘর। ওই ঘরে তাঁর আর ফেরা হলো না কোনওদিন।

তিন

হরিশপুর গ্রামে সিরাজ শাহ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন বেহারা। পালকি চালান ছিল তাঁর কাজ। তখন বেহারাদের 'কাহার'ও বলা হত। এই কাহার বা বেহারা পরিবারের অতি ছোটঘরের মুসলমান মানুষ সিরাজ শাহ। তিনি বাইরের জীবন যাপনে ছিলেন খুবই সাদাসিদা কিন্তু ভেতরে ভেতরে একজন বিরাট ভাবসাধক। বিখ্যাত আমানদী শাহ ছিলেন সিরাজশাহর গুরু। আমানদী শাহর গুরুর নাম আগর (আকবর) মানিক শাহ। তিনি আবার চট্টগ্রামের বিখ্যাত সাধক আমানতুল্লাহ শাহের শিষ্য।

সিরাজ শাহ একদিন লালনের গান শোনেন। লালন তখন গান করেন কিন্তু গানের অর্থ বোঝেন না। শুধু সুরেই তিনি পাগল হন। সিরাজশাহ লালনের গান শুনে জানান এই গান মানবদেহ নিয়ে। বুঝিয়ে দেন গানের অর্থ।

লালন অবাক হয়ে শোনেন সিরাজ শাহর বলা মর্মকথা। তারপর বিভিন্ন সময় লালন তাঁর গান নিয়ে চলে যান সিরাজ শাহর কাছে। সিরাজ শাহ তাঁকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দেন সহজে। যতই সিরাজ শাহর কাছে যান লালন ততই অবাক হন। পিতার মতো শ্রদ্ধা করতে শুরু করেন তাঁকে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর লালন এসে ওঠেন সিরাজ শাহর বাড়িতে। এখানে অসম্ভব স্বাধীনতা তাঁর। কোনও কাজ নেই কর্ম নেই শুধু গান আর গান। তাছাড়া সিরাজ শাহ সারাদিন পালকি বহনের কাজ করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে লালনকে নিয়ে প্রত্যেকদিন বসতেন গানের আলোচনায়। বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে সিরাজ শাহর সঙ্গে লালনের

আলাপ হত।

এভাবে কেটে যেতে লাগল অনেক দিন। এরপর একদিন এক সাধু লালনকে বললেন, 'গুরু ধর, গুরু ছাড়া পথের দিশা মেলে না।

কিন্তু সত্যিকারের গুরু তিনি কোথায় পাবেন! কাকে তিনি গুরু মানবেন? সাধুর মুখ থেকে এমন কথা শোনার পর রাতে তাঁর একটুও ঘুম হলো না। শেষ রাতের দিকে ডাকলেন সিরাজ শাহকে। তাঁর কাছে মুরিদ হবার ইচ্ছা জানালেন লালন।

সিরাজ বললেন, লালন, আমি লেখাপড়া জানি না। সামান্য বেহারার বংশে জন্ম আমার। বহু নামকরা ফকির দরবেশ আছেন তুমি তাঁদের কাছে যাও। যাঁকে তোমার ভাললাগে তাঁর কাছে মুরিদ হও।

সেই উপদেশে তাঁর মন ভরে না। তিনি সিরাজের কাছে মুরিদ হলেন। সিরাজ শাহর পা চুম্বন করে লালন হয়ে গেলেন তাঁর শিষ্য। গুরু হলেন সিরাজ শাহ। এভাবেই শুরু হলো লালনের সাধক জীবন।

শিষ্যত্ব গ্রহণের পর লালন গুরু সেবায় মনোযোগ দেন। সিরাজের ঘরবাড়ির বহু কাজ লালন নিজে হাতে করতে থাকেন। আগের মতো শুধু গানবাজনা না করে গানের মর্মকথা বুঝতে চেষ্টা করেন। কিছুদিন আগে এলাকায় যাঁর পরিচিতি গড়ে উঠেছিল বয়াতি লালন হিসেবে আস্তে আস্তে তিনি হয়ে ওঠেন সাধক লালন হিসেবে। গুরু সিরাজ শাহ মনেপ্রাণে দীক্ষা দিতে থাকেন তাঁর শিষ্যকে। মোট কথা গুরু শিষ্য মিলে একাকার হয়ে যান দুজনে।

চার

হরিশপুর গ্রামে ছিল তখন বহু ফকির দরবেশের আস্তানা। জাত ধর্ম এসবের বিচার না করে সব শ্রেণীর মানুষ একত্রিত হত বিভিন্ন সময়। সুফিবাদ বা মরমীবাদ নিয়ে তখন এই গ্রামের বিভিন্ন আসরে আলোচনা হত। বহু ভক্তগণ এক জায়গায় মিলেমিশে কান্নাকাটি করতেন খোদার কাছে। জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হতো এই সমস্ত জলসায়।

হরিশপুর গ্রাম থেকে এক সময় মরমীবাদের এই বাণী বহু এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সাধু দরবেশদের সান্নিধ্য আর সিরাজ শাহর কাছ থেকে দীক্ষা পেয়ে লালন হয়ে যান পুরোপুরি সাধক। ধর্মের ভেতর বাহির দুটো দিকই তাঁর জানা হয়ে যায়।

এসময় গুরু সিরাজ শাহ একদিন লালনকে আদেশ করেন লালন তুমি বিবাহ কর। গুরুর আদেশ মানতে লালন বিবাহ করেন হরিশপুরের মেছের শাহ ফকিরের বোনকে। বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই লালনের স্ত্রী মারা যান। স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি দুঃখ পান। তবে সেই শোকের কারণে তিনি সাধনা থেকে একটুও সরে যাননি।

লালনের এই আন্তরিকতা আর গুরু ভক্তি দেখে সিরাজ শাহ মুগ্ধ হন। তিনি তাঁকে ফকিরি প্রদানের কথা ভাবেন। গুরুর কাছ থেকে তিনি লাভ করেন খেরকা পোশাক।

এদিকে সিরাজ শাহর বয়স হয়েছে, মৃত্যু তাঁর নিকটে। সাধক সিরাজ শাহ তা আগাম জানতে পারেন। লালনকে ডেকে বললেন, লালন আমি

চলে গেলে তুই গাঁয়ে আর থাকিস নে, উত্তর মুলুকে চলে যাস, সেখানে তোর নাম হবে, তুই হবি উঁচু দরের সাধক।

১৭৯৮ সালের শেষের দিকে লালনের গুরু, যাকে তিনি পিতার মতো শ্রদ্ধা করতেন সেই সাধক সিরাজ শাহ মারা গেলেন। লালনের বয়স তখন ছাব্বিশ বছর। গুরুকে হারিয়ে তিনি এত দুঃখ পেলেন, মনে হলো দুনিয়ায় তাঁর আর আপন বলতে কেউ থাকল না।

সিরাজ শাহর স্ত্রী লালনের গুরু মা লালনকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনও বুঝ লালন শোনেন না। এভাবে কাটে একবছর। এর মধ্যে মারা যান গুরু মা। লালন নাওয়া খাওয়া ত্যাগ করেন। কারও সঙ্গে কথা বলেন না। তারপর একদিন কোথায় যেন তিনি উধাও হয়ে যান। এরপর এই গ্রামে লালনকে আর কোনওদিন দেখা যায়নি।

অনেকদিন অনেক বছর কেটে যায়। কে কার খবর রাখে। হরিশপুর গ্রামের মানুষ জানে না তাদের লালন এখন কোথায়। এমনকি তার ভাইয়েরাও তার খবর জানেন না।

গুরুকে হারিয়ে পথে নামেন লালন। এ পথ সে পথ বহু পথে হাঁটেন তিনি। উপমহাদেশের বহু আউলিয়া, দরবেশ, সাধুদের কাছে যান। বহু আস্তানায় কাটান দিনের পর দিন। এরপর একসময় হাজির হন পশ্চিম বাংলার নদীয়া জেলার নবদ্বীপে। এখানে ছিল অনেকগুলো বৈষ্ণব আশ্রম। আশ্রমে থাকতেন অনেক সাধক সাধিকা।

নদীয়ার নবদ্বীপ এখনও বৈষ্ণব সাধকদের লীলাভূমি। এখানকার আখড়ায় বহু দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসত।

ঐ সময় নবদ্বীপে পদ্মাবতী নামে এক বিধবা রমণী ছিলেন। তিনি নামকরা বৈষ্ণব। লালন তাঁর আশ্রমে আশ্রয় নেন। পদ্মাবতীকে তিনি মা বলে ডাকতেন। পদ্মাবতীও লালনকে সন্তানের স্নেহে বহু উপদেশ দিতেন। কিন্তু পদ্মাবতীর কাছে লালনের বেশিদিন থাকা হয়নি। নবদ্বীপের কিছু বৈষ্ণবদের আচরণে তিনি বিরক্ত হন এবং একদিন উধাও হন নবদ্বীপ থেকে।

আবার ঘুরতে শুরু করলেন লালন। এখানে সেখানে ঘুরে হাজির

হলেন রাজশাহীর প্রেমতলীতে। এখানে প্রত্যেকবছর বৈষ্ণব মেলা অনুষ্ঠিত হত। এই মেলাকে 'খেতুরির মেলা' বলা হত। চলত একমাস ধরে। পুরো মাসটাই লালন থাকলেন এখানে। বহু সাধু সন্ন্যাসি সাক্ষাত লাভ করলেন তিনি। নানা ধরনের লোকের দেখা পেয়ে খুশিতে তাঁর মন ভরে গেল।

খেতুরির মেলা শেষ হলো। এবার ঘরে ফেরার পালা। লোকজন যে যার ঘরে ফিরছে। কিন্তু লালন তো ঘর ছেড়েছে বহু আগে। তার তো ঘর নেই। তবুও এই জায়গা থেকে অন্যকোথাও যেতে তো হবে তাই অনেকের সঙ্গে তিনিও এক নৌকায় চেপে বসলেন। পদ্মার পানিতে নৌকা চলছে, ছুটছে দক্ষিণ দিকে। ছোট নৌকা কূল ঘেষে ঘেষে চলছে। বহুদূরের পথে যাবে এই নৌকা। লালন তাঁর একতারা হাতে করে বসে আছেন নৌকার গুলইর দিকটায়। মাঝে মাঝে জলের ডেউ ভিজিয়ে দিচ্ছে নৌকার যাত্রীদের। লালন উদাসভঙ্গিতে তাকিয়ে আছেন নদীর দিকে। কারও সঙ্গে কোনও কথা বলছেন না। তাঁর ভেতরটা কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ছে। প্রথম দিনটা ভালই কেটেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে লালন অসুস্থ হয়ে পড়েন। শুয়ে পড়েন নৌকার পাটাতনে। তৃতীয় দিন তাঁর সারা শরীরে দেখা দেয় গুটি বসন্ত। তখন গুটি বসন্ত মানে নির্ঘাত মরণ। তাছাড়া এই রোগিকে যে ছুয়েছে সেও মরবে। গুটি বসন্ত হলে ভাগ্যক্রমে যদি দুএকজন বাঁচে তাও আবার অন্ধ বোবা কালা হয়ে বেঁচে থাকে। ভয়াবহ এই মরণ ব্যাধিটি অবশ্য এখন আর দেখা যায় না। পৃথিবী থেকে গুটি বসন্ত একেবারেই বিদায় নিয়েছে।

লালনের এই অসুখ দেখে নৌকার অন্য যাত্রীরা তো ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সবাই তাঁকে নৌকা থেকে নেমে যেতে বলল। কিন্তু কীভাবে নামবে লালন। গায়ে যে একটুও শক্তি নেই। উঠে বসার মতো অবস্থাটাও হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। এভাবে আরও একদিন কেটে গেল। নৌকা তখন পদ্মা ছেড়ে গড়াই হয়ে কালিগঙ্গা নদীতে প্রবেশ করেছে। এসময় গভীর রাত। লালনের অবস্থা খুবই খারাপ, একদম মরে মরে! যাত্রীরা সবাই অস্থির। সমস্ত যাত্রীরা যখন ভীষণ ক্ষেপে গেল তখন মাঝিরা বেহুশ লালনকে ফেলে গেল এক বালুচরে।

পাঁচ

কুষ্টিয়ার এক গ্রামের নাম ছেঁউড়িয়া। বহু লোকের বাস এখানে। এই গ্রামের মলম কারিকর। ভাববাদি মানুষ তিনি। প্রত্যেকদিন ভোরবেলা তিনি বেড়াতে আসতেন নদীর ধারে। নদীর চর দিয়ে তিনি হাঁটতেন নিয়মিত। দূর থেকে দেখতে পান কী যেন একটা নদীর ধারে পড়ে আছে। তখন চারিদিকটা একটু একটু অন্ধকার। ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না দূর থেকে। মলম আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে চমকে উঠলেন! একি! এতো লাশ পড়ে আছে!

মলম ঠিকমতো খেয়াল করে দেখলেন যে, না, মৃত নয়, জীবিত এক বসন্ত রোগী। সারা গায়ে প্রকট ঘা। তিনি ভেবে পান না যে কে এই ব্যক্তি এবং কেনইবা পড়ে আছে এই বালুচরে।

মায়ার শরীর মলমের। জাপটে ধরে নিয়ে যান এই রোগিকে তাঁর নিজ ঘরে। নরম বিছানা করে শুইয়ে দেন তাঁকে। তারপর ডেকে আনেন গ্রামের কবিরাজকে। বিভিন্ন গাছগাছড়া দিয়ে চিকিৎসা করার ফলে কয়েকদিনের মধ্যে অনেকটা সেরে ওঠেন। জ্ঞান ফিরে আসে তাঁর। একমাসের মধ্যে একেবারে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন লালন। শরীরের কোথাও কোনও রোগের লক্ষণ থাকে না। শুধু মুখের দিকটায় থেকে যায় কতগুলো বসন্তের দাগ।

এসময়ের মধ্যে মলম ও তাঁর স্ত্রী জানতে পারেন যে, এই বসন্তের রোগির নাম–লালন শাহ। সংসারত্যাগী এক সাধক তিনি। সাধক সিরাজ শাহ তাঁর গুরু। এই মহান ব্যক্তিকে তাঁরা এভাবে পেয়ে মহাখুশি। তাঁরা দুইজনে মিলে লালনের মুরিদ হন।

ছেঁউড়িয়া গ্রামের অধিকাংশ লোক পেশায় ও পদবীতে কারিকর। তাঁদের মধ্যে ছিল ধর্মীয় গোঁড়ামি। তারা মরমীবাদকে পছন্দ করত না। মলমের এভাবে লালনকে আশ্রয় দেয়া এবং তার মুরিদ হওয়াটাকে কেউ স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছিল না। তারা এমনও কথা তুলেছিল, কী জাত কী ধর্ম না জেনে এমন লোককে আশ্রয় দেয়া ঠিক হয়নি। গ্রামের মাতব্বররা মলমকে একঘরে করে রাখার জন্য একটা শালিসও ডেকেছিল। সভায় লালনকে যখন জাত নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল তখন লালন বলেছিলেন–

'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে?
লালন বলে জাতির কি রূপ দেখলাম না দুই নজরে।।

লালনের এমন জবাব শুনে তো সভার সমস্ত লোক নীরব হয়ে যান। তাঁরা বুঝে ফেলেন এ কোনও সাধারণ মানুষ নয়। এ এক মহামানুষ। তাঁর বিরুদ্ধে এরকম সভা করা অন্যায়। সবাই লালনের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। অনেকে তাঁর শিষ্য হন। আর ছেঁউড়িয়া গ্রামে লালন 'ছেউড়িয়ার সাইজি' হিসেবে সবার কাছে পরিচিত হন। মলম কারিকর এই গুণী সাধককে আশ্রয় দেয়ার জন্য পরিচিতি পান মলম শাহ ফকির হিসেবে। মলম শাহ তাঁর সমস্ত সম্পত্তি লালন শাহর নামে উইল করে দেন। ১৬ বিঘা জমির উপর মলম শাহর বাড়ি। পুরো বাড়িটার মালিক এখন 'ছেউড়িয়ার সাঁইজি' বা লালন শাহ। এই বাড়িতে তৈরি হয় সাঁইজির আস্তানা। ধ্যান করার জন্য নিরিবিলি ঘর। ভক্তদের সঙ্গে দেখা করার ঘর ইত্যাদি।

ছেঁউড়িয়ার এই মলম শাহর বাড়িই একসময় লালন শাহর আখড়া বলে পরিচিত হয়। এখানে বসেই তিনি গান রচনা করতেন। তিনি বলতেন আর শিষ্যরা লিখতেন।

ছয়

ছেঁউড়িয়াতে লালনের আখড়ায় সবসময় বসতো সাধুসভা। ভাবগান, পদাবলী, গজল, কীর্তন এসব চলতো রাতদিন। দূরদূরান্ত থেকে আসতো ভক্তরা। ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় এসে লালনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন–শীতল শাহ, ভোলাই শাহ, পাঁচু শাহ, শুকুর শাহ, দয়াল শাহ, দুদু শাহ।

এছাড়া মানিক শাহ ও মনিরুদ্দিন শাহ তাঁর শিষ্যত্ব নেন, এবং লালনের গান শুনে শুনে লেখার কাজ করেন। তাঁরা দুজন লালনের গানগুলোকে খাতায় লিখে রাখেন যাতে করে তা হারিয়ে না যায়।

লালনের অনেক শিষ্য তৈরি হয়েছিল যারা গুরুর প্রভাবে ভাল ভাবসঙ্গীত রচনা করতে পারতেন। দুদু শাহ গুরুর কাছ থেকে শিখে নিয়েছিল ভাববাদের এই সঙ্গীত রচনার কৌশল। দুদু চমৎকার চমৎকার গান লিখতেন। তাঁর সঙ্গীত রচনার দক্ষতা দেখে লালন অবাক হতেন। দুদু শাহকে তিনি আপন পুত্রের মতো জানতেন। তাঁকে ডাকতেন 'বাবা' বলে। শীতল ও ভোলাই শাহকেও নিজ পুত্রের মতো জানতেন। তাঁদের দুজনকে ছেঁউড়িয়ার আখড়া দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

ছেঁউড়িয়ার জীবনে লালন কত যে গান রচনা করেছেন তার সঠিক হিসেবে কারও জানা নেই। তবে তিনি এসময় বহু সংখ্যক গান লিখেছেন এবং আসরে গেয়েছেন। শিষ্যদের দিয়ে গাইয়েছেন।

লালন তাঁর সাধনার প্রয়োজনে বিশখা নামের এক মহিয়সী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। বিশখা ছিলেন ছেঁউড়িয়া গ্রামে এক নামকরা ঘরের মেয়ে। লালনের শিষ্যরা বিশখাকে গুরুমা বলে ডাকতেন। তাঁরা তাঁকে খুব

শ্রদ্ধা করতেন। বিশখাও লালনের সকল শিষ্যদের সন্তানের মতো স্নেহ করতেন।

বিশখার ঘরে কোনও সন্তান হয়নি। তাই লালন এক কন্যাকে লালন পালন করেছেন। স্ত্রী, পালিত কন্যা আর অগণিত শিষ্যদের নিয়ে ছেউড়িয়ায় ছিল লালনের বিশাল সংসার।

তিনি একেবারে সংসারত্যাগী নন। তিনি সবাইকে নিয়ে ভাবের সংসারে বাস করতেন। এভাবে ছেঁউড়িয়ায় 'ফকিরি ঘরানায়' তাঁর কেটেছে অনেক বছর। এসময়গুলো লালনের কীভাবে কেটেছে তার তেমন কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। তবে যতদূর জানা যায় এসময়ে এক পরম আত্মার সন্ধানে, স্রষ্টাকে পাওয়ার জন্য ধ্যান, সঙ্গীত রচনা, আর শিষ্যদের জ্ঞান দান করিয়ে তিনি সময় কাটিয়ে দিয়েছেন।

মৃত্যুর মাসখানেক আগে লালন অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিছানায় শুয়ে শুয়েই তাঁর সময় কাটে। এরমধ্যে চেষ্টা করে যান গান রচনার।

মৃত্যুর আগে লালন জানতেন তাঁর সময় শেষ হয়ে গেছে। তাই শেষ যেদিন তিনি গান করলেন–সেদিন তাঁর চোখ ভেজা। রাতভর বহু গান করলেন। ভোররাতে গাইলেন–

পার কর হে দয়াল–চাঁদ আমারে।
ক্ষম হে অপরাধ আমার, এ-ভব কারাগারে।।

না হলে তোমার কৃপা
সাধন-সিদ্ধি কোথা বা
কে করতে পারে,
আমি পাপী তাইতো ডাকি
ভক্তি দাও মোর অন্তরে।।

পাপী অধম জীব হে তোমার
তুমি যদি না কর পার
দয়া প্রকাশ করে,
পতিত পাবন পতিত নাশন
কে বলবে আজ তোমারে।।

জলে স্থলে সব জায়গায়
তোমারি সব কীর্তিময়
এ ত্রিবিধ সংসারে,
তাই না বুঝিয়ে অবোধ লালন
প'ল বিষম ঘোরতরে।।

এই গানের অর্থ বুঝে যান তাঁর শিষ্যরা। হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেন তাঁরা। তাঁদের গুরু সাধকপুরুষ লালন একি বলছেন! তার গানের কথায় এ কিসের ইঙ্গিত! চলে যাবেন লালন! এ যেন ভাবতেই পারছিলেন না ভক্তরা!

গান থামিয়ে লালন উপদেশবাণী দিলেন শিষ্যদের। এরপর উড়ে গেল তাঁর প্রাণ পাখি।

১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর বাংলা ১২৯৭ সালের ১ কার্তিক শুক্রবার লালন চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে।

পাখি কখন জানি উড়ে যায়।
একটি বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়।।

খাঁচায় আড়া প'লো ধ্বসে,
পাখি আর দাঁড়াবে কিসে,
ঐ ভাবনা ভাবছি বসে
চমক জ্বরা বচ্ছে গায়।।

কার বা খাঁচা কেবা পাখি,
কার জন্যে মোর ঝুরে আঁখি
আমারই আঙিনায় থাকি
পাখি আমারে মজাতে চায়।।

আগে যদি যেত জানা,
জংলা কভু পোষ মানে না,
তবে উহার প্রেম করতাম না।
লালন ফকির কেঁদে কয়।।

এই গানের মতোই লালনের প্রাণপাখি উড়ে গেল সেদিন। ভক্তরা কেঁদে বুক ভাসাল। বহু দূর থেকে লোকজন এল তাঁকে একনজর দেখার জন্য।

সাত

ছেঁউড়িয়ায় আখড়াতে লালনের মৃত্যদেহ দাফন করা হলো। তাঁর মৃত্যুর একশো বছর পরে আজও এই আখড়াতে লালনের পবিত্র মাজারে প্রত্যেক বছর মৃত্যু দিনে বসে লালন মেলা। ভক্তরা গান করেন কাঁদেন মরমী সাধক লালন শাহর জন্য। উপমহাদেশের সকল বাউল সমাজ লালন শাহকে তাঁদের গুরু জানেন।

আমাদের লোকসঙ্গীতের এই সাধক পুরুষ লালন শাহর গানের প্রতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিল দারুণ আকর্ষণ। লালনের একটি দেহতত্ত্ব গান–

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
ক'মনে আসে যায়....।

এটি রবীন্দ্রনাথকে এতই মজিয়েছিল যে তিনি গানটির ইংরেজি অনুবাদ করে ফেলেছিলেন। কবিগুরু ১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন মহাসভায় ইংরেজি বক্তৃতায় গানটার উল্লেখ করে বলেছিলেন–'গ্রামের অনামা গীতিকারের এই গানে অচিনপাখির পাখার ধ্বনি সাধারণ চাষীর মনেও এনে দেয় অবাক করা অনুভব।

গ্রামের এই অনামা গায়ক ও গীতিকার লালন সে সময়ে সভ্যসমাজে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু গ্রামীণ পরিবেশে তাঁর গান খুব লোকপ্রিয় ছিল। গলায় গান নিয়ে যেমন তিনি যেতেন শিষ্যদের বাড়ি, তেমনই শিষ্যরা দল বেঁধে আসত তাঁর আখড়ায় গানের টানে, গুরু সঙ্গের লোভে। লালন তখন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠতেন, 'ওরে আমার পুন (পোনা) মাছের ঝাঁক

এসেছে।'

লালন শাহ প্রসঙ্গে তাঁর প্রিয় শিষ্য দুদু শাহ লালন জীবনী লিখেছেন কবিতার মাধ্যমে। ছন্দে ছন্দে চমৎকারভাবে গুরুর পরিচয় তুলে ধরেছেন দুদু শাহ।

'ধন্য ধন্য মহামানুষ দয়াল লালন সাঁই।
পতিত জনার বন্ধু তাঁর গুণ গাই।।

জাতি ধর্ম শাস্ত্র আদি মীমাংসা করিয়া
নব সত্য প্রকাশিল মানব লাগিয়া।।

আমার দয়াল মুরশিদ কৃপা প্রকাশিয়া।
তাঁর আত্মকথা কিছু গিয়াছে বলিয়া।।

তাঁর মহা-আত্মকথা আমি কি জানিব।
যার কথা সে যদি না কয় কিসে প্রকাশিব।।

আলমডাঙ্গা গ্রামে শুকুর শা'র আশ্রমে।
আরজি করিনু আমি অতিব নির্জনে।।

দয়াল দরদি সাঁই করুণা করিয়া।
কহ কিছু আত্মকথা এ দাসে বুঝাইয়া।।

এত শুনি দয়াল সাঁই মোর পাণে চায়।
মৃধু হাসি এই দাসে যাহা কিছু কয়।।

বহুদিন সেই কথা রাখিনু ঢাকিয়া।
সাঁইজির ছিল মানা নাহি প্রকাশিবা।।

নাহি জানি কবে আমি যাইব চলিয়া।
তাঁর আত্মকথা যাইবে গোপন হইয়া।।

একারণে শেষকালে লজ্যি তাঁর বাণী।
একান্ত বিনয়ে লিখি তাঁর জীবনী।।

মুখতাছার তার কিছু বর্ণনা করিব।

তাঁহার চরণমূলে ফানা হয়ে যাব।।

এগারশো ঊনআশি কার্তিকের পহেলা।
হরিশপুর গ্রামে সাঁইর আগমন হইলা।।

যশোহর জিলাধিন ঝিনাইদহ কয়।
উক্ত মহাকুমাধিন হরিশপুর হয়।।

গোলাম কাদির হন দাদাজি তাঁহার।
বংশপরম্পরা বাস হরিশপুর মাঝার।।

দরিবুল্লাহ দেওয়ান তাঁর আব্বাজির নাম।
আমিনা খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম।।

শিশুকালে সাঁইজিরে তাঁরা ছাড়ি গেলা।
অনাথ হইল চাঁদ বিধাতার খেলা।।

এমনি নিদানকালে বৈশাখ মাসেতে।
আনমনে একাকী সে রহে বসে পথে।।

সাঁইজির লীলাখেলা কে বুঝিতে পারে।
সিরাজ শা দরবেশে দেখে নিল তাঁরে ঘরে।।

কুলবাড়ি হরিশপুর সিরাজ শা'র বাস।
পালকি টানিয়া করে জীবিকার অন্বাষ।।

কালক্রমে সাঁই তাঁরে বায়াৎ করিল।
মানুষ তত্ত্বাদি সব বুঝাইয়া দিল।।

ছাব্বিশ বৎসর যবে বয়স তাঁহার।
উহারও ছাড়ি গেল নিজ নিজ ঘর।।

এমনি কিশোর কালে ফকিরের বেশে।
নবদ্বীপ ধামে গিয়া আপনি প্রকাশে।।

পদ্মাবতী নামে এক বিধবা রমণী।
নিজাবাসে লয়ে গেল সেই ক্ষত্র-ধনী।।

পদ্মাবতীর গৃহে কিছুকাল যায়।
একদিন যান এক পণ্ডিত সভায়।।

পণ্ডিতমণ্ডলী তারে বিবিধ পুছিল।
সাঁইজি নাম ধাম সকলি বলিল।।

সেবার সময় হইল পণ্ডিত সবার।
যবন বলিয়া দূরে সেবা দেয় তাঁর।।

সাঁইর লীলা কিছুমাত্র বুঝা নাহি যায়।
প্রতি একজনার মাঝে লালনে দেখায়।।

উহা দেখি পণ্ডিতগণ চমকিত হইল।
সবে ভাবে মনে মনে কোন জন আইল।।

ছলিতে আইল বুঝি গৌরাঙ্গ সুজন।
দূরে রেখে সেবা দিনু কাহারে এখন।।

তখনি সকলে মিলি গৌরধ্বনি করে।
করজোড়ে নত শিরে দুটি পদ ধরে।।

মিনতি করিয়া কাঁদে দয়াল গোঁসাই।
মোদের ছলিতে এলে মোরা বুঝি নাই।।

ক্ষমা কর দীনবন্ধু পাতকী জনারে।
গড়াগড়ি যায় আর এমত ফুকারে।।

তখনি দয়াল সাঁই বুঝাইয়া বলে।
বিভিন্নতা করিওনা জাতি ধর্ম বলে।।

আলেখ অধর সেই দয়াময় সাঁই।
সৃষ্টি-স্থিতি জুড়ে তার জাতি গোত্র নাই।।

জাতি-ধর্ম কুলগোত্র মানুষের সৃজন।
ভিন্ন বলে কিছু আমি দেখি না কখন।।

সকল জনার মাঝে একই সেই ঈশ্বর।

নানানস্থানে নানারূপে করেন বিহার।।

এই মতে একে একে নানা মহালীলা।
কাশী বৃন্দাবন ধামে গিয়া প্রকাশিলা।।

যুগ-অবতার বলি সর্বভক্তগণ।
করিতে লাগিল তাঁর চরণ বন্ধন।।

হেনকালে একদিন খেতরী গেরামে।
উপনীত হইলেন ভ্রমণ কারণে।।

তথা হইতে নৌকাযোগে ভ্রমণ কারণ।
দক্ষিণ-পূর্ব দেশে করিলেন গমন।।

কি জানি কেমনে তিনি বসন্ত ব্যাধিতে।
আক্রান্ত হইলে তাঁরে ফেলায় নদীতে।।

ভক্তবৃন্দ নাহি ছিল সঙ্গেতে তাহার।
মাঝিগণ ফেলে তারে দরিয়া মাঝার।।

ভাসিতে ভাসিতে তিনি কালিগঙ্গা তীরে।
ছেঁউড়িয়া গ্রামের পাশে এক ঘাট ধারে।।

ভাসিতে ছিলেন যবে অচেতন হালেতে।
দেখি পরমাত্মা ভাই মলম নামেতে।।

সযতনে তুলে আনে আপনার ঘরে।
দুগ্ধ আদি নানা পথ্য দিয়া সেবা করে।।

এইরূপ একমাস গুজারিয়া যায়।
ব্যাধি মুক্ত হন তিনি খোদার কৃপায়।।

একদা মলম মম পরমাত্মা ভাই।
অমন ভক্ত পদে প্রণাম জানাই।

নিজমনে তেলাওয়াত করেন কোরান।
সাঁই ভুল ধরি তারে করান ফরমান।।

কি পড় কোরান মিঞা এত ভুল করি।
শুনিয়া মলম ভাই পুলকিত ভারি।।

নিষ্ঠা বচনে তবে তাহারে শুধায়।
কি করে জানিলে তুমি পাঠে ভ্রান্তি হয়।।

এত শুনি সাঁই তারে বুঝাইয়া দিল।
নাহি জানি লেখাপড়া ইহাই বলিল।।

দয়াল মুরশিদ মোরে লাদুন্নির জ্ঞান।
কিঞ্চিৎ দিয়াছে তায় করিনু বয়ান।।

এইভাবে দিনে দিনে দিন গত হইল।
মলম শা ভাই তারে গুরু করে নিল।।

বাড়ির দক্ষিণ দিকে তেঁতুল তলায়।
আস্তানা করিয়া দিল মুরশিদ সেবায়।।

স্বামী-স্ত্রী দুইজনে তাহার কদমে।
হাজের হইয়া রহে হুজুরী মোকামে।।

তখন তাহার বয়স তেতাল্লিশ হইল।
চারিদিক হইতে বহু ভক্ত জুটিল।।

নানা দেশ হতে শেষে আসে নানাজন।
তর্ক করিতে কেহ করে আগমন।।

চক্কর ফক্কর আর মানিক মলম।
কোরবান মনিরদ্দি আসে কতজন।।

কতজন ছিল মোর প্রভুর গোলাম।
কি কব তাদের পদে হাজার সালাম।।

বাহাছ করিতে গিয়া বায়াৎ হইনু।
আমি অতি অভাজন লালন সাঁই বিনু।।

বারশত সাতানব্বই বাঙালা সনেতে।

পহেলা কার্তিক শুক্রবার দিবা অন্তে।।

সবারে কাঁদায়ে মোর প্রাণের দয়াল।
ওফাৎ পাইল মোদের করিয়া পাগল।।

মো অধমে বাবা বলে কে আর ডাকিবে।
আমার এই দীন মুখে চুম্বন করিবে।।

অমন মধুর বাণী কে আর শোনাবে।
আর কি ছেঁউড়িয়া ধামে করুণা বর্ষিবে।।

চাঁদের বাজার কিগো মিলাইবে আর।
হিন্দু-মুসলমান সবে করে হাহাকার।।

আমি দীন দুদ্দু নাম দীনের অধিন।
সারা অঙ্গে আজু মোর আজারির চিন।।

বেলতলা হরিশপুরে জনম আলয়।
কেহ কেহ কুলবাড়ি হরিশপুর কয়।।

শাস্ত্র ধর্ম তীর্থ আদি সর্ব প্রবচন।
সকল ছাড়িয়া ছিলেন মানুষ-ভজন।।

বস্ত ছাড়া নাহি আর আল্লা কিংবা হরি।
এই মত দেখ সবে নরবস্ত ধরি।।

যাহা বুঝিয়াছি আমি তাহার কৃপায়।
কাহারে বুঝাব উহা আধার কোথায়।।

লালন শাহ যখন পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। সে সময় কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া থেকে হিতকরি নামে একটা পত্রিকা প্রকাশিত হত।

লালন শাহ মারা গেলেন ১৮৯০ সালে ১৭ অক্টোবর, আর হিতকরের ১৩তম সংখ্যা প্রকাশ পেল অক্টোবরের ৩১ তারিখে।

পত্রিকাটির এই সংখ্যায় লালন শাহ সম্পর্কে উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ 'মহাত্মা লালন ফকির' প্রকাশিত হয়। এই লেখাটি থেকে একশো বছর

আগে মৃত্যুবরণ করা লালন সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়।

লালন ফকিরের জীবিতকাল, জন্মতারিখ জীবনযাপন ইত্যাদি ব্যাপারে গবেষকদের মধ্যে মিল অমিল রয়েছে। কিন্তু তাঁর গান, সুর নিয়ে কারও মধ্যে কোনও মত পার্থক্য নেই।

লালন কোন জাতের কোন কালের সে সবের চেয়েও বড় কথা লালন কবি, সাধক এবং বড়মানুষ। চণ্ডিদাসের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন

'সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই'

লালন তাঁর গানে নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন বিভিন্ন নামে। বলেছেন, লালন ফকির, ফকির লালন, দরবেশ লালন, অবোধ লালন, লালন শাহ। আবার শিষ্যরা বলেছেন–সাঁই, ফকির, ওলি, কামেল, পীর, কুতুব, দরবেশ, তালেবুল মওলা, গোসাই ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্যে তিনি লালন শাহ বা লালন ফকির নামেই বেশি পরিচিত।

গবেষকরা তাঁকে কবি, মরমী কবি, সুফি ইত্যাদি বলেও তুলে ধরেছেন। সবার কথার মাঝেই লালন শাহকে বড় করে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। লালন বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বাউল। আর বাউল লালনের পরিচয় মেলে তাঁর বহু ধরনের গানের মাধ্যমে।

তার প্রায় সমস্ত গানই আধ্যাত্মিক। যার ভেতরকার মর্মবাণী খুব গভীর। তিনি মানুষের একাল-সেকাল, জন্ম-মৃত্যু নিয়ে আশ্চর্য সব গান লিখেছেন।

সৃষ্টিকর্তার গুণকীর্তন করে তিনি অনেক গান লিখেছেন। এই প্রকারের গানগুলোর মধ্যে আল্লাহ রাসুল ইত্যাদি প্রসঙ্গ আছে।

লালন লিখেছেনঃ

এলাহি আলমিন গো আল্লাহ
বাদশাহ আলমপানা তুমি।
ডুবায়ে ভাসাতে পার
ভাসায়ে কিনার দাও কারো

রাখ মার হাত তোমার
তাইতে তোমায় ডাকি আমি।।

নূহ নামে এক নবীরে
ভাসালে অকুল পাথারে,
আবার তারে মেহের করে,
আপনি লাগাও কিনারে,
জাহের আছে ত্রি-সংসারে
আমায় দয়া কর স্বামী।।

নিজাম নামে বাটপার সে তো
পাপেতে ডুবিয়া রইতো
তার মনে সুমতি দিলে
কুমতি তার গেল চলে
আউলিয়া নাম খাতায় লিখিলে
জানা গেল এ রহমি।।

নবী না মানিল যারা
মোয়াহেদ কাফের তারা
সেই মোয়াহেদ দায়মাল হবে
বেহিসাব দোজখে যাবে
আবার তারে খালাস দিবে
লালন কয় মোর কি হয় জানি।।

লালন এরকম গানের মধ্যে আরও লিখেছেনঃ

ক্ষম ক্ষম অপরাধ
দাসের পানে একবার চাও হে দয়াময়।
বড় সংকটে পড়িয়ে এবার
বারে বার ডাকি তোমায়।।

তোমার ক্ষমতায় আমি

যা কর তাই পার তুমি
রাখ মার সে নামনামি
তোমারই এ জগতময়।।

পাপী অধম তরাতে সাঁই
পতিত পাবন নাম শুনতে পাই
সত্য-মিথ্যা জানবো হেথায়
তরাইতে আজ আমায়।।

কসুর পেয়ে মার যারে
আবার দয়া হয় তাহারে
লালন বলে এ সংসারে
আমি কি তোর কেহ নয়।।

রাসুল সম্পর্কে লালন লিখেছেনঃ

নবী না চিনিলে কি আল্লাহ পাবে।
নবী দীনের চাঁদ আজ দেখনা রে ভেবে।।

যার নূরে সয়াল সংসার
কলির ভাবে নবী পয়গম্বর
হাটের গোলমাল মনরে তারে
চিনলাম না ভবে।।.....

বোঝা কঠিন কুদরতি খেয়াল
নবীজী গাছ সাঁইজি তার ফল
সে ফল যে পাড়ে, ঐ গাছে চড়ে
লালন কয় কাতর ভাবে।।

সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে লালন তাঁর গানে বহু তথ্য দিয়েছেন। তাঁর সেই গান শুধুই গান নয় তা সকল মানুষের জন্য অমর বাণী। বলেছেন–

সাঁই আমার কখন খেলে কোঁন খেলা
জীবের কি সাধ্য আছে গ'ণে পড়ে তাই বলা।।

কখন ধরে আবার
কখন রয় নিরাকার
কেউ বলে আকার সাকার
অপার ভেবে হই ঘোলা।।.....

তাঁর গানের কথায় বেশি বলেছেন মানুষের কথা।
লালন লিখেছেনঃ

মানুষ তত্ত্ব সত্য হয় যার মনে।
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে।।
মাটির ঢিবি কাঠের ছবি
ভূত-ভবিষ্যৎ দেবাদেবী
ভোলে না সে কোন রূপী
মানুষ ভজণে জ্ঞানে।।

জোরই, শোরই, লালা, ঝুলা
পেঁচো পেঁচী, আলাভোলা
তাতে নয় সে ভোলনেয়ালা
মানুষ-রতন চেনে।।

ফেয়ো, ফেপী, ফেক্‌শি যারা
ভাকা-ভোকায় ভোলে তারা
লালন তেমনি চটামারা
দাঁড়ায় না একখানে।।

গানটিতে মানুষের বর্ণনা দিতে গিয়ে লালন তাঁর নিজের স্বভাবেরও অনেকখানি বর্ণনা দিয়েছেন।

মানুষ প্রসঙ্গে লালন আরও লিখেছেনঃ

মানুষ মানুষ সবায় বলে।
কোন মানুষের বাস কোন দলে।।

অযোনী সহজ সংস্কার
কি সাধনে সাধবো এবার
বড় অসম্ভব মানুষ লীলে
মানুষ লীলে।।

সংস্কার সাধন না জানি
কোথা পাই সহজ কোথা অযোনী
বেড়াই গোলে হরিবোল বলে
গোলে হরিবোল বলে।।

তিন মানুষের করণ বিচক্ষণ
জানলে হবে এক নিরূপণ
অধীন লালন পলো গোলমালে
পলো বিষম গোলমালে।।

আরও লিখেছেনঃ

মানুষ ভজলে মানুষ হবি।
মানুষ ছেড়ে খ্যাপারে তুই মূল হারাবি।।

দ্বিদলে আর মৃণালে
সোনার মানুষ উজলে
মানুষ গুরুর কৃপা হলে
জানতে পাবি।
গাছে যেমন আলেকলতা
এই মানুষে মানুষ গাঁথা
জেনে শুনে মুড়াও মাথা
যাতে তরবি।।

মানুষ ছাড়া মন আমার

পড়বি রে তুই ঘোর আঁধারে
লালন বলে মানুষ আকার
ভজলে তাঁকে পাবি।।

মানুষের মন এমন এক বস্তু যা দেখা যায় না। শুধু অনুভব করা যায়। এই অদৃশ্য মন দুনিয়ার সুখ শান্তির নেশায় পাগল হয়। আসল ফেলে নকলের দিকে ছুটে যায়। মন মানতে চায় না কোনও কারণ। সেই অশান্ত মনকে লালন তার গানের মাধ্যমে শান্ত করতে চেয়েছেন।

দেখ না মন ঝাক্‌মারিয়া এই দুনিয়াঁদারি।
পরিয়ে কোপনি-ধ্বজা মজা উড়ালো ফকিরি।।

বড় আশার বাসা এ ঘর
প'ড়ে রবে কোথারে কার
ঠিক নাই তারি।
সেদিন খালি হাতে একা পথে
বিদায় করে দেবে তোরি।।

যা কর তাই কর রে মন
পিছের কথা রেখ স্মরণ
বরাবরি।
তোমার পিছে পিছে ঘুরছে শমন
কোনদিন হাতে দিবে দড়ি।।

ভাবের ভাই বন্ধুজনা
ম'লে সঙ্গে কেউ যাবে না
মন তোমারি।
সিরাজ সাঁই কর শোন্‌রে লালন
হসনে কারো এন্তজারী।।

লিখেছেনঃ

মনের মনে হলো না একদিনে।

ছিলাম কোথায়, এলাম হেথায়
যাব কার সনে।।

পাকা দালান কোঠা দিব
মহাসুখে বাস করিব
ভাবলাম না কোন্ দিনে যাব
যাব শ্মশানে।।

আমার বাড়ি আমারই ঘর
বলা কেবল ঝাকমারি সার
এক পলকে হইতে সংহার
হবে কোন দিনে।।

কি করিতে কিবা করি
পাপে বোঝাই হলো তরী
লালন কয়, তরঙ্গ ভারি
দেখি সামনে।।

মন নিয়ে লালন আরও লিখেছেনঃ

না হলে মন সরলা, কি ধন মেলে কোথা ধু'ড়ে।
হাতে হাতে বেড়ও কেবল তৌবা পড়ে।।

মুখে যে পড়ে কালাম, তারই সুনাম
হুজুরী বাড়ে
যার মন খাঁটি নয় বাঁধলে কি হয়,
বনে কুঁড়ে।।

মক্কা যাবি ধাক্কা খাবি
মন না জুড়ে।
হাজি নাম পাড়াবি লোক জানাবি
জগৎ জুড়ে।।

মন যার হয়েছে খাটি, মুখে যদি

গলদ পড়ে।
খোদা তারে নারাজ নয় রে
লালন ভেড়ে।।

এই গানে লালন বোঝাতে চেয়েছেন যে, মন ঠিক না হলে মক্কায় গিয়ে হজ্ব করে এলে লোকে হয়তো হাজি বলবে কিন্তু আসলে কি তাতে কোনও লাভ হবে? মুখে মুখে দোয়া কালাম পড়লে লোকে তাকে বড় হুজুর ভাববে, সম্মান করবে। অথচ মন ঠিক না করে শুধু শুধু মানুষ দেখান কাজ করলে খোদা তায়ালার সঙ্গে কোনওদিনও যোগাযোগ হবে না।

লালন মানুষের মনকে উপদেশ দিয়েছেন এভাবেঃ

সত্য বল্ সুপথে চল ওরে আমার মন।
সত্য সুপথ না চিনিলে পাবে না মানুষের দরশন।।

খরিদদার মহাজন যে জন
ও তার বাটখারাতে কম
তারে কসুর করবে যম,
গদিয়ান মহাজন যে জন
বসে কেনে প্রেম-রতন।।

পরের দ্রব্য পরের নারী
হরণ করো না
পারে যেতে পারবে না,
যতোবার করিবে হরণ
ততোবার হবে জনম।।

লালন ফকির আসলে মিথ্যে
ঘুরে বেড়ায় তীর্থে তীর্থে,
সই হলো না এক মন দিতে
আসলেতে প'ল কম।।

মনকে এত বুঝানোর পরও মন বুঝ মানে না সে চলে তার নিজের

ইচ্ছায়। তাই লালন বলেছেনঃ

মনরে বুঝাবো কত।
যে পথে মরণ-ফাঁসী
সেই পথে মন সদায় রত।।

যে জলে লবন জন্মায়
সেই জলে লবন গলে যায়
অমনি আমার মন মনুরায়
মরণ-ফাঁসী নিচ্ছে সে তো।।

চারের লোভে মৎস যেয়ে
পড়ে সে চারের উপরে
তেমনি আমায় মনভেয়ে
আপনার আপনি হচ্ছে হত।।

সিরাজ শাহ ফকিরের বাণী
বুঝবি লালন দিনি দিনি
শক্তিহারা ভাবুক যিনি
সে কি পাবে গুরুপদ।।

অন্য একটি গানেও তিনি এইরকম বলেছেনঃ

আমি কি দোষ দিব কারে রে।
আপন মনের দোষে পেলাম রে ফ্যারে।।
সুবুদ্ধি সু-স্বভাব গেল
কাকের স্বভাব মনে হলো।
ত্যেজিয়ে অমৃত ফল
মাখাল ফলে মন মজিল রে।।

যে আশায় এই ভবে আশা
ভাঙ্গিল রে আশার বাসা
ঘটিল রে কি দুর্দশা

ঠাকুর গড়তে বানর হলো রে।।

গুরুবস্তু চিনলি না মন
অসময় কি করবি তখন
বিনয় করে বলছে লালন
যজ্ঞের ঘৃত কুত্তায় খেলো রে।।

সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টা বাস করেন। তাই প্রত্যেক জীবকে ভালবাসলেই সৃষ্টিকর্তাকে ভালবাসা হয়। জীবের মাঝে স্রষ্টাকে আবিষ্কারের ইচ্ছা নিয়ে লেখা লালনের এরকম গানকে লালন গবেষকরা 'আত্মতত্ত্ব' গান বলেছেন। যেমনঃ

যার আপন খবর আপনার হয় না।
আপনার আপনি চিনতে পারলে রে
যায় অচেনারে চেনা।।

সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
দেখ্ না।
আমি ঢাকা দিল্লি হাতড়ে ফিরি
কোলের ঘোর তো যায় না।
আত্মা রূপে কর্তা হরি
নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি
ঠিকানা।
বেদ-বেদান্ত পড়বি যত্ত
বাড়বে তত লখ্না।।
অমৃত নদীর সুধা
পান করিলে ভব ক্ষুধা
রয় না।
লালন ম'লো জল-পিপাসায়।
থাকতে নদী মেঘনা।।

অথবা,

আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে।
আমি জনম ভরে একদিন দেখলাম নারে।।

নড়ে চড়ে ঈশান কোণে
দেখতে পাইনে দুই নয়নে
হাতের কাছে যার
ভবের হাট বাজার
ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে।।

সবে বলে প্রাণ পাখি
শুনে চুপে চেপে থাকি
জ্বলে কি হুতাশন
মাটি কি পবন
কেউ বলে না একটা নির্ণয় করে।।

আপন ঘরের খবর হয় না
বাঞ্ছা করি পরকে চেনা
লালন বলে পর
বলতে পরওয়ার
সে কেমন রূপ আমি কি রূপ রে।।

এ ধরণের অন্য একটি বিখ্যাত গান হচ্ছেঃ

কে কথা কয়রে দেখা দেয় না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে, খুঁজলে জনমভর মেলে না।।

খুঁজি তারে আছমান জমি
আমারে চিনিনে আমি
এ বিষম ভ্রমে ভ্রমি
আমি কোন জন সে কোন জনা।।

রাম রহিম বলছে যে জন
ক্ষিতি জল কি বাও হুতাশন
শুধালে তার অন্বেষণ
আমায় মূর্খ বলে কেউ বলে না।।

হাতের কাছে হয় না খবর
কি দেখতে যাও দিল্লি-শহর
সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তোর
সদায় মনের ঘোর গেল না।

একটা সময় লালন কোন জাতের, কোন গোত্রের কোথায় তাঁর জন্ম এইসব নিয়ে অনেক কথা উঠেছিল। লালনের জাত নিয়ে যারা কথা বলেছিল তাঁদের সামনেই লালন জবাব দিয়েছিলেনঃ

সব লোকে কয়, লালন কি জাত সংসারে
লালন বলে, জাতির কিরূপ দেখলাম
না দুই নজরে।।.....

জাত নিয়ে লালন আরও বলেছেনঃ

সব লোকে কয়, লালন ফকির হিন্দু কি যবন।
লালন বলে, আমার আমি না জানি সন্ধান।।

একই ঘাটে আসা-যাওয়া
একই পাট্‌নী (মাঝি) দিচ্ছে খেওয়া
কেউ খায় না কারো ছোঁয়া
ভিন্ন জল কে কোথায় পান।।
বেদ-পুরানে করেছে জারি
যবনের সাঁই, হিন্দুর হরি
এও তো আমি বুঝতে পারি
দুইরূপ সৃষ্টির কি প্রমাণ।।

যে জাতেরই হোক মৃত্যুর পর সবাই নিঃশেষ হয়ে ধুলায় মিশে যাবে। তাহলে জাতের গৌরব করে লাভ কী! ঠিক এই কথাই বলেছেন লালন তাঁর অন্যএকটি গানে।

জাতির গৌরব কোথায় রবে।
যখন এসব ফেলে যেতে হবে।।

বামুন, কায়েত, কামার, কুলু
ভিন্ন ভিন্ন ভাবছ সবে,
এসব ঘুচবে সেদিন, তোমায় যেদিন
রাজাধিরাজ তলব দিবে।।

গড়েছে এক কারিগরে
স্ত্রী পুরুষ ভঙ্গীভাবে,
তাদের চাল-চলনে সবায় চিনে
ঢাক্‌লে না ঢাকা রবে।।

যত সব বিষয়-আশয়
কিছু নাহি সঙ্গে যাবে,
একবার মুদলে নয়ন, করবে শয়ন
মাটির দেহ মাটি হবে।।

জাতকুল সবই বিফল
জাত লয়ে কি পারে যাবে,
সিরাজ শাহ কয় ওরে লালন
ভাব আখেরেতে কিবা হবে।।

লালনের গানের অন্য এক প্রকার ভাগ করেছেন গবেষকরা। তা হচ্ছে দেহতত্ত্ব। মানব দেহকে বিভিন্ন উপমা বা উদাহরণ দিয়ে তিনি তাঁর গানে উল্লেখ করেছেন। এই প্রকার গানের মধ্যে 'খাচার ভিতর অচিন পাখি ক'মনে আসে যায়....' বিখ্যাত।

তাছাড়া লিখেছেনঃ

চিরদিন পুষলাম এক অচিনপাখি।

ভেদ পরিচয় দেয় না আমায়
ঐ খেদে ঝুরে আঁখি।।

পাখি বুলি বলে শুনতে পাই
রূপ কেমন তার দেখিনে ভাই
বিষম ঘোর দেখি।
কোনদিন জানি উড়ে যাবে
ধুলো দিয়ে দুই চোখি।।

পোষা পাখি চিনলাম না
এ লজ্জা তো যাবে না।
উপায় করি কি।
চেনার পেলে চিনে নিতাম
যেত মনের ধুকধুকি।।

আছে নয় দরজা খাঁচাতে
যায় আসে কোন পথে
চোখে দিয়ারে ভেলকি।
সিরাজ সাঁই কয়, বয় লালন বয়
ফাঁদ পেতে ঐ সিঁদ-মুখি।।

লালন শাহ দেহকে মনে করেছেন একখানা বড়ঘর। এই ঘরে মনিমুক্তা হীরে জহরত সবই বোঝাই করা। তারপরে ঘরের দরজায় লাগান আছে একখানা তালা। সেই তালার চাবি সৃষ্টিকর্তার হাতে।

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে।
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখবো চোখেতে।।

আপন ঘরে বোঝাই সোনা
পরে করে লেনা-দেনা
আমি হলাম জন্মকানা
না পাই দেখিতে।।

রাজি হলে দারোয়ানী
দ্বার ছাড়িয়ে দেবেন তিনি
তারে বা কই চিনি-শুনি
বেড়াই কুপথে।।

এই মানুষে আছে রে মন
যারে বলে মানুষ-রতন
লালন বলে পেয়ে সে ধন
পারলাম না চিনিতে।।

মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যকে নিয়ে লালন রচনা করেছেন অনেক গান। এই গানগুলিকে 'গৌরতত্ত্ব' বিষয়ক গানে ভাগ করা হয়েছে। এ গানের মধ্যে রয়েছে

যদি গৌর চাঁদকে পাই
গেল গেল এ ছার কুল
তাতে ক্ষতি নাই।।

কি ছার কুলের গৌরব করি
অকুলের কুল গৌর হরি
এভব-তরঙ্গে তরী
গৌর গোঁসাই।।

জন্মিলে মরিতে হবে
কুল কি কারো সঙ্গে যাবে
মিছে কেবল দুইদিন ভবে
কুলের বড়াই।।

ছিলাম কুলের কুলবালা
স্কন্ধে নিলাম আঁচলা-ঝোলা
লালন বলে, গৌরবালা
আর কারে ডরাই।।

গৌরতত্ত্ব গানের মধ্যে জনপ্রিয় একটি গান হচ্ছেঃ

তোরা যাসনে ও পাগলের কাছে।
তিন পাগলের হলো মেলা নদেয় এসে।।

একটা পাগলামি করে
কোল্ দেয় জাত-অজাতেরে
দৌড়িয়ে যেয়ে,
নাই জাতের বোল এমন পাগল
কে দেখেছে।।

একটা নারকেলের মালা
তাতে জল তোলা ফেলা
করঙ্গ সে,
হরি বলে পড়ছে ঢলে
ধুলোর মাঝে।।

দেখতে যে যাবি পাগল
সেইতো হবি পাগল
বুঝাবি শেষে।
ছেড়ে তোর ঘর দুয়ার
ফিরবি নেচে।।

পাগলের নামটি এমন
বলিতে অধীন লালন
হয় তরাশে,
অদে নিতে চৈতে পাগল
নাম ধরেছে।।

লালন ছিলেন ধার্মিক। বিশ্বাস করতেন পরকালে। তাই তাঁর গানে পরকাল এসেছে বারবার।

লিখেছেনঃ

কোথায় হে দয়াল কাণ্ডারী
এ ভব তরঙ্গে আমার, এসে কিনারায় লাগাও তরী।।

তুমি হে করুনাসিন্ধু
অধম জনার বন্ধু
দাও হে আমায় পদারবিন্দু
যাতে তুফান তরিতে পারি।।

পাপী যদি না তরাবে
অধম তারণ নাম কে লবে
জীবের দ্বারা ইহাই হবে
নামের ভেরম যাবে তোমারি।।

ডুবাও ভাসাও হাতটি তোমার
এ ভবে আর কেউ নাই আমার
লালন বলে দোহাই তোমার
চরণে স্থান দাও তরি।।

আরও লিখেছেনঃ

পার কর হে দয়াল-চাঁদ আমারে।
ক্ষম যে অপরাধ আমার, এ ভব কারাগারে।
না হ'লে তোমার কৃপা
সাধন সিদ্ধি কোথা বা
কে করতে পারে,
আমি পাপী তাইতে ডাকি
ভক্তি দাও মোর অন্তরে।।

পাপী অধম জীব হে তোমার
তুমি যদি না কর পার
দয়া প্রকাশ ক'রে,
পতিত পাবন পতিত নাশন

কে বলবে আজ তোমারে।।

জলে স্থলে সব জায়গায়
তোমারি সব কীর্তিময়
এ ত্রিবিধ সংসারে,
তাইনা বুঝিয়া অবোধ লালন
প'ল বিষম ঘোরতরে।।

পরপারে সৃষ্টিকর্তা যেন তাকে পার করে দেন কঠিন ফুলসেরাত। এই প্রার্থনা করেছেন তিনি তাঁর অন্য একটি গানে।

পারে লয়ে যাও আমায়।
(আমি) অপার হয়ে আছি বসে
ওহে দয়াময়।।

আমি একা রইলাম ঘাটে
ভানু সে বসিল পাটে
তোমা বিনা ঘোর সংকটে
না দেখি উপায়।।

নাই আমার ভজন-সাধন
চিরদিন কুপথে গমন
নাম শুনেছি পতিত-পাবন
তাইতে দেই দোহায়।।

অগতির না দিলে গতি
ওই নামে রবে অখ্যাতি
লালন কয় অকুলের পতি
কে বলবে তোমায়।।

পরকাল পারাপার নিয়ে আরও লিখেছেনঃ

একদিনও পারের ভাবনা ভাবলি নারে।

পার হবি চুলের সাঁকো কেমন করে।।

বিনা কড়ির সওদা কেনা
মুখে আল্লার নাম জপনা
তাতে কি অলসপনা
দেখি তোরে।।

এক দমের ভরসা নাই
কখন কি করিবেন সাঁই
তখন কার দিবি দোহাই
কারাগারে।।

ভাসাও অনুরাগ তরী
বসাও মুরশিদ-কাণ্ডারী
লালন কয়, যার যার পাড়ি
যাওনা সেরে।।

এ সম্পর্কে অন্যএকটি গানও বিখ্যাত-

ক্ষম অপরাধ, ওহে দীননাথ
কেশে ধরে আমায় লাগাও কিনারে।
তুমি হেলায় যা কর তাই করতে পার
তোমা বিনা পাপীর তারণ কে করে।।

না বুঝে পাপ-সাগরে ডুবে খাবি খাই
শেষ কালেতে তোমার দিলাম গো দোহাই।
এবার যদি মোরে না তরাও গো সাঁই
তোমার দয়াল নামের দোষ রবে সংসারে।।

পাপীকে তরাতে পতিত পাবন নাম
তাইতো তোমায় ডাকি ওহে গুণধাম
তুমি আমার বেলায় কেনো হলে বাম
আমি আর কতকাল ভাসবো দুঃখের সাগরে।।

শুনতে পাই পরম পিতা গো তুমি
অতি অবোধ বালক আমি
তোমার সুপথ ভুলে কুপথে ভ্রমি
তুমি দাও না কেনো সুপথ স্মরণ করে।।

অথায় তরঙ্গ আতঙ্কে মরি
কোথায় রইলে ওহে দয়াল কাণ্ডারী
লালন বলে তরাও হে তরি
নামের মহিমা জানাও ভব-সংসারে।।

লালন সব সময় প্রস্তুত ছিলেন ওপারে যাবার জন্য। তার অর্থ কখন মৃত্যু আসে কখন যেতে হয় সেজন্য তিনি সদা প্রস্তুত। লিখেছেনঃ

আয় কে যাবি ওপারে।
দয়াল চাঁদ মোর দিচ্ছে খেয়া অপার সাগরে।।

পার করে সে জগত বেড়ি
লয় না কারো টাকাকড়ি
সেরে সুরে মনের দেড়ি
ভার দে না রে।।

যে দিল তাঁর নামের দোহাই
তারে দয়া করিলেন সাঁই
এমন দয়াল আর দেখি নাই
ভব-সংসারে।।

দিয়ে ঐ চরণে ভার
কত পাপী হইলো পার
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার
ঘোর যায় না রে।।

ঠিক এই গানের মতোই আরেকটি গানঃ

পারে কে যাবি নবীর নৌকাতে আয়।

রূপ-কাঠের নৌকাখানি নাহি ডোবার ভয়।।

বে-শরা নারে যারা
তুফানে যাবে মারা
একই ধাক্কায়,
কি করবে তোর বদর গাজি
থাকবে কোথায়।।

নবী না মানে যারা
মোয়াহেদ কাফের তারা
এই দুনিয়ায়,ভজনে তার নাই মজুরি
দলিলে সাফ লেখা যায়।।

যে মুরশিদ সেই তো রাছুল
তাহাতে নাই কোনো ভুল
খোদা সে হয়,
লালন কয় না এমন কথা
এ কথা দলিলে কয়।।

মরণের পরের জীবন নিয়ে লালন বহু-গান লিখেছেন। এই গানগুলোকে পরমতত্ত্ব গান হিসেবে ভাগ করা হয়। গানগুলোতে আছে মানুষ কেন পৃথিবীতে এসেছে এবং মরণের পরে মানুষ কোথায় যাবে ইত্যাদি সব কথা।

লালন লিখেছেনঃ

কে তোমার আর যাবে সাথে।
কোথায় রবে ভাই-বন্ধুগণ
পড়বি যেদিন কালের হাতে।।

নিকাশের দায় করে খাড়া
মরবে রে আতশের কোড়া
সোজা করবে ব্যাঁকা তেড়া

জোর-জবর খাটবে না তাতে।।

যে আশায় ভবে আসা
হলো না তার রতিমাশা
ঘটলো রে এ কি দূর্দশা
কুসঙ্গে কুরঙ্গে মেতে।।

যারে ধরে পাবি নিস্তার
তারে সদায় ভাবলিরে পর
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার
ছাড় ভবের কুটুম্বিতে।।

মহাকাল, পরকাল নিয়ে তিনি লিখেছেনঃ

কি করি কোন পথে যাই
মনে কিছু ঠিক্ পড়ে না।
দোটানাতে ভাবছি ব'সে
এই ভাবনা।।

কেউ বলে মক্কা যেয়ে
হজ্ব করিলে যাবে গোনা,
কেউ বলিছে মানুষ ভজে
মানুষ-হ-না।।

কেউ বলে-পড়লে কালাম
পায় সে আরাম, ভেস্তখানা,
কেউ বলে ভাই, ও সুখের ঠাঁই
কায়েম রয় না।।

কেউ বলে মুরশিদের ঠাঁই।
খুঁজিলে পাই মূল ঠিকানা,
লালন ভেড়ো তাই না বুঝে
হয় দোটানা।।

আরও লিখেছেনঃ

এদেশেতে এই সুখ হলো, আবার কোথা
যায় ঐ জানি।
পেয়েছি এক ভাঙ্গা তরী, জনম গেল সেচতে পানি।

আর কিরে এই পাপীর ভাগ্যে
দয়াল চাঁদের দয়া হবে
কতদিন এই হালে যাবে
বাহিয়া পাপের তরণী।।

আমি বা কার, কে বা আমার
প্রাপ্য বস্তু ঠিক নাহি তার
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার
উদয় হয় না দিনমণি।।

কার দোষ দিব এ ভুবনে
হীন হয়েছি ভজন-গুনে
লালন বলে কত দিনে
পাব সাঁইর চরণ দুখানি।।

লালন শাহর গানে শ্রীকৃষ্ণের কথা আছে। আছে তাঁর জীবনযাপন। শ্রীকৃষ্ণ একটা সময় গরু চরিয়েছেন। তাঁর সেই রাখাল জীবনের বর্ণনা এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন করেছেন লালন।

বনে এসে হারালাম কানাই।
কি বলবো মা যশোদায়।।

খেললাম সবে লুকোলুকি
আবার হলো দেখাদেখি
কানাই গেলো কোন্ মুলুকি
খুঁজে নাহি পাই।।

ছিদাম বলে নেব খুঁজে
লুকাবো কোন্ বন মাঝে
বলাই দাদা বলে বুঝি সে
দেখা দেয় না ভাই।।

সুবোল বলে পলো মনে
বলেছিল একদিনে
যাব গুপ্ত বৃন্দাবনে
গেল বুঝি তাই।।

খুঁজে খুঁজে হলাম সারা
কোথায় গেলি মনচোরা
আর বুঝি দিবি না ধরা
লালন বলে কি হলো হায়।।

এই সমস্ত গান ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লালন লিখেছেন বহু গান।
লিখেছেনঃ

সকলি কপালে করে
কপালের নাম গোপালচন্দ্র
কপালের নাম গুঁয়ে-গোবরে।।

যদি থাকে এই কপালে
রত্ন এনে দেয় গোপালে
কপালে বেমতি হলে
দুর্বাবনে বাঘে মারে।।

কেউ রাজা আর কেউ ভিখারি
কপালে করে সবারি
মনের ফ্যারে বুঝতে নারি
খেটে মরি অনাকারে।।

যার যেমন মনের করুণা

তেমনি ফল পেয়েছে সে-না
লালন বলে কাঁদলে হয় না
বিধির কলম আর কি ফেরে।।

লিখেছেনঃ

সময় গেলে সাধন হবে না।
দিন থাকতে দ্বীনের সাধন
কেন জানলে না।।

জান না মন জল শুকালে
থাকে না মীন খালে-বিলে
কি হবে তার বাঁধাল দিলে
শুকনা মোহনা।।

অসময়ে কৃষি করে
মিছেমিছি খেটে মরে
গাছ যদি হয় বীজের জোরে
ফল ধরে না।।

অমাবস্যা পূর্ণিমা হয়
মহাযোগ সেদিনে উদয়
লালন বলে তার সময়
দণ্ডেক বই রয় না।।

লালনের আসল ছবি প্রসঙ্গ

আট

লালন শাহ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন এখন থেকে প্রায় ১২০ বছর আগে। এত দীর্ঘ সময় পরও লালনের গান দারুণ জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয় শিল্পী, কবি, সাধক দেখতে কেমন ছিলেন তা নিয়ে অনেকেরই খুব আগ্রহ। কিন্তু তাঁর তো কোনও ফটো ছিল না। তখন কি আর ক্যামেরা ছিল। এখন যেমন যেখানে সেখানে স্টুডিও। ইচ্ছে করলেই ফটো তোলা যায়, তারপর যত্ন করে বাঁধিয়ে রাখা যায়। তখনকার সময়ে কারুর ছবি তুলতে হলে শিল্পীকে ডাকা হতো কিংবা শিল্পীর বাড়িতে গিয়েই হাজির হতে হতো। বসে থাকতে হতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা একদম পুতুল হয়ে। শিল্পী যেভাবে ডানে ঘুরে বা বামে ঘুরে বসতে বলতেন সেভাবেই বসতে হতো, একটুও নড়াচড়া করার উপায় ছিল না। এভাবে অবিকল ফটো এঁকে দিতেন শিল্পীরা। আর সেটাই বহু যত্নে বাঁধাই করে রাখা হত। লালন শাহকেও এভাবে শিল্পীর তুলিতে আঁকা হয়েছিল তবে তা জানা গেল বহু বছর পর।

এই ছবির খবর কেউ জানতই না।

১৯১৬ সালে নন্দলাল বসু তাঁর কল্পনা শক্তি দিয়ে লালনের একখানা কাল্পনিক ছবি আঁকলেন। এই ছবিটিকেই সবাই লালনের আসল চেহারা বলে জানতে লাগল। ছবিটি বিখ্যাত হয়ে গেল। লালন সম্পর্কে লেখা সব বই পুস্তকে তা ছাপা হতে লাগল।

কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা আসলে লালনের ছবিই না, এতো কল্পনা মাত্র। লালনের আসল ছবি সম্পর্কে খুব মজার গল্প রয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নতুন দাদা' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন খুব

প্রতিভাবান। তিনি নিত্যনতুন সব কাজ করতে খুব উৎসাহবোধ করতেন। গান লিখতেন, গাইতেন, নাটক লিখতেন। ভাল পিয়ানো বাজাতে পারতেন। ছবি আঁকতেন তিনি। চেনা অচেনা খ্যাত অখ্যাত যেকোনও লোকের হুবহু ছবি। যাকে বলে প্রোট্রেট বা প্রতিকৃতি তা দ্রুত এঁকে রাখতেন নিজের খাতায়। এই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খাতায় একটা ছবি পাওয়া গেল। চেয়ারে বসা এক বৃদ্ধ। বয়সের ভারে তিনি ঝুঁকে পড়েছেন। হাতে তাঁর একখানা লাঠি। স্বাস্থ্য খুব দুর্বল। ছবিটির নীচে শিল্পী লিখে রেখেছেন–'লালন ফকির (শিলাইদহ বোটের উপর) 5th May 1889.

এই ছবিটির মাধ্যমেই লালন ভক্তরা জানতে পারলেন তাঁদের প্রিয়মানুষের চেহারা কেমন ছিল।

লালন শাহ কোনও বিদ্যালয় বা পাঠশালায় পড়েননি। কিন্তু তিনি মুর্খ ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড জ্ঞানী। তাঁর গানের কথায় বোঝা যায় তাঁর ভেতর কী পরিমাণ জ্ঞানের আধার দিল। সে সময়কার হিতকরী পত্রিকা তাই লিখেছিল, 'তিনি লেখা পড়া জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোনও শাস্ত্রই পড়েন নাই, কিন্তু ধর্ম্মালাপে (ধর্ম নিয়ে আলোচনা) তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত।'

আমাদের দেশ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এদেশে এখন গুণীজনদের কদর করার ধারাবাহিকতা অল্প হলেও শুরু হয়েছে। সেই হিসেবে লোক সাহিত্যে, লোক সঙ্গীতের সবচেয়ে জনপ্রিয় বাউল সাধক লালন শাহর প্রতিও আমাদের দেখাতে হবে সম্মান। সংরক্ষণ করতে হবে তাঁর গান। এজন্য বড়দের পাশাপাশি ছোটদেরও লালনের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে হবে।

লালন শাহের বংশতালিকা

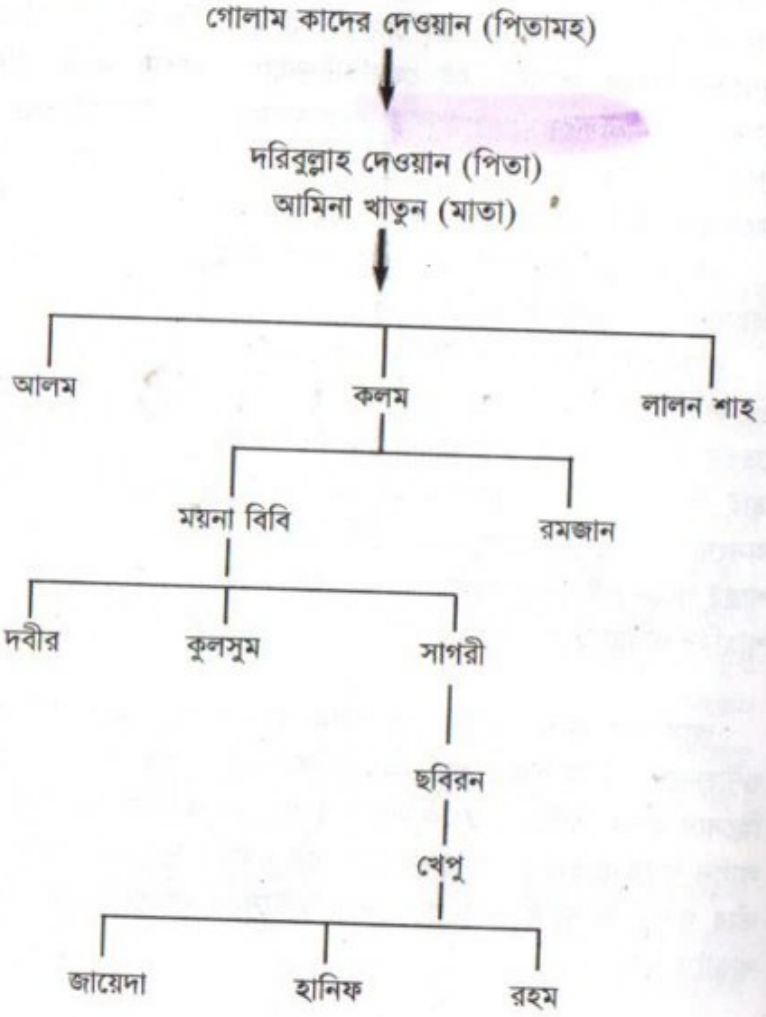

লালন শাহ
জীবনপঞ্জি

নাম ঃ লালন শাহ

জন্ম ঃ ১৭৭২ সালের ১৭ অক্টোবর, বাংলা ১১৭৯ সালের ১ কার্তিক।

জন্মস্থান ঃ ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু থানার হরিশপুর গ্রামে।

পিতা ঃ দরিবুল্লাহ দেওয়ান

মাতা ঃ আমিনা খাতুন

ভাই ঃ তিন ভাই। আলম, কলম ও লালন [তিনি সবার ছোট]।

মৃত্যু ঃ ১৭ অক্টোবর ১৮৯০ বাংলা ১ কার্তিক ১২৯৭ সাল।

মৃত্যুস্থান ঃ কুষ্টিয়া জেলার ছেঁউড়িয়া।

লালনের জীবিতকাল ঃ (১৭৭২-১৮৯০) ১১৮ বছর (প্রায়) ।

শৈশব ঃ ১ বছর বয়সের সময় পিতার মৃত্যু। ৫/৬ বছর বয়সে মার মৃত্যু।
প্রথমে ভাইয়ের সংসারে রাখালের কাজ ও পরে হরিশপুর গ্রামের ইনু কাজির বাড়িতে রাখালের কাজ করেন।

সঙ্গীত জীবন ঃ ১৭৮৫-৮৬ সালে বিভিন্ন জারি সারির অনুষ্ঠানে যোগদান।
পরবর্তী সময়ে জারিগানের দল করে গান গাওয়া ও গান লেখার কাজ করলেন।
সিরাজ শাহর সঙ্গে পরিচয়।
ভাইয়ের সংসার থেকে রাগ করে চলে আসেন।
সিরাজ শাহকে গুরু বা মুরশিদ হিসেবে গ্রহণ করেন।
১৭৯৮ সালে ২৬ বছর বয়সে লালনের গুরু সিরাজ শাহর মৃত্যু।
গুরু মার মৃত্যুবরণ।

গুরুর আদেশ মতো দূরে পাড়ি জমান।
নদীয়ার নবদ্বীপে আগমন।
বৈষ্ণব রমণী পদ্মাবতীর কাছে মাতৃস্নেহে আশ্রয়।
১৮১৫ সালে ৪৩ বছর বয়সে রাজশাহীতে খেতুরির মেলায় যোগদান ও বসন্ত রোগে আক্রান্ত।
মলম কারিকরের আশ্রয়ে।
কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়াতে আখড়া নির্মাণ।
১৮৮৯ সালে ১১৭ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনের ছবি আঁকেন।
১৮১৬-১৮৯০ অসংখ্য গান রচনা ও শিষ্যদের জ্ঞানদান করেন।

দীক্ষাগুরু ঃ সিরাজশাহ

শিষ্য ঃ দুদ্দুশাহ (১৮৪১-১৯১৯), মনিরুদ্দিন শাহ (১৮২০-১৯০৫), ভোলাই শাহ (১৮৪৫-১৯৪০), পাঁচু শাহ (১৮২৩-১৯২৮), খোদা বকশ শাহ (১৮৬৫-১৯৪৭), শুকচাঁদ শাহ (১৮৮৭-১৯৫০)

সঙ্গীত শিষ্য ঃ পাঞ্জু শাহ (১৮৫১-১৯১৪), ওছিমুদ্দিন খোন্দকার (১৮৫৬-১৮৯১), শামসউদ্দিন খোন্দকার (১৮৭৭-১৯৪৮), অমূল্য শাহ (১৮৭৯-১৯৫২), জহরদ্দি শাহ (১৮৪২-১৯০৮)

লালন সাধক ঃ সৈয়দ শাহ কাছেম আলী (১৮৫৩-১৯৩৪), পাগলা কানাই (১৮০৯-১৮৮৯), গোঁসাই গোপাল (১৮৬৯-১৯১২)

লালন প্রভাবিত আধুনিক কবি সাহিত্যিক ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪), কাঙাল হরিনাথ (১৮৩৩-১৮৯৬)।

বিশিষ্ট লালন গবেষক আবুল আহসান চৌধুরীর লালন শাহ বই থেকে একটি লেখা তোমাদের জন্য তুলে ধরা হলো ঃ

রবীন্দ্রনাথ ও লালন শাহ

বাউলের দর্শন ও সঙ্গীত বাঙলার অনেক কৃতী পুরুষকেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাউলদর্শন ও সঙ্গীতের বা'র-বাড়ীতে বিচরণ করেননি শুধু, আপনজনের মতো তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন, আত্মীয়তা স্থাপন করে একাত্ম হয়েছেন অবশেষে। তাঁর প্রাণ ধর্মের প্রেরণা আর বাউলের প্রেরণার উৎস ছিলো অভিন্ন। তাই বাউলের 'মনের মানুষ' তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'র একটি ঐক্য ও সাযুজ্যবোধ সহজেই আবিষ্কার করা সম্ভব বাউলগানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানববাদী জীবনচেতনার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। বাউলের গান আর সহজ-সাধনার ভাব একসময়ে রবীন্দ্রমানসে নিবিড়ভাবে মিশে গিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ-কবিতা-গানে বাউলের প্রসঙ্গ নানাভাবে বহুবার এসেছে। বাউল-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগের কথা বিভিন্ন সূত্রে উচ্চারিত হয়েছ। তাঁর আত্মজৈবনিক কবিতার ভাষ্যেও বাউলচেতনার সঙ্গে একাত্মতার পরিচয় ঘোষিত হয়েছে ঃ

তরুণ যৌবনের বাউল
সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,
ডেকে বেড়ালো
নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
অনির্দেশ্য বেদনার খেপা সুরে।

[পঁচিশে বৈশাখ ঃ শেষ সপ্তক]

এইভাবে ক্রমশ তিনি রূপান্তরিত হয়েছেন 'রবীন্দ্রবাউল'। বাউলের গানের সুর, বাণী ও তত্ত্বকথা যেমন তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, তেমনি বাউলের বেশভূষায়ও তিনি প্রভাবিত হয়েছেন—বাউলের আলখাল্লা তাঁর পোশাকের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রমানসে এই বাউলপ্রভাবের মূলে লালনের গান ও তাঁর শিষ্য-সম্প্রদায়ের সাহচর্য সবচেয়ে বেশি কাজ করেছিল বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ও লালন সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ

রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ

যে মরমীসাধকের প্রভাব রবীন্দ্রমানসে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরিচয় ও সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে দ্বিমত আছে। কেউ কেউ ধারণা করে থাকেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু অপরপক্ষের বক্তব্য, এই সাক্ষাৎকারের কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য বা প্রামাণ্য বিবরণী নেই, কেবল জনশ্রুতি ও অনুমানই এই ধারণার উৎস।

রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাৎকারের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় প্রকাশিত জলধর সেনের (১৮৬০-১৯৩৯) কাঙাল-জীবনীতে। লিখেছেন তিনি ঃ

শুনিয়াছি, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহের কুঠিতে লালন ফকির একবার গান করিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাহ্ন তিনটা পর্য্যন্ত গান চলিয়াছিল; ইহার মধ্যে কেহ স্থানত্যাগ করিতে পারেন নাই।

তবে রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাৎকারের ধারণাটি সবচেয়ে বেশি প্রচার ও প্রশ্রয় লাভ করেছে শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর একটি রচনার সৌজন্যে। পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ (বৈশাখ ১৩৫২) গ্রন্থে তিনি 'লালন ফকিরের সঙ্গে মোলাকাৎ' নামে একটি কাহিনী পরিবেশন করেন। এই কাহিনীই কথিত সাক্ষাৎকারের প্রধান উৎস। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে শচীন্দ্রনাথ এই মত প্রত্যাহার করে পাদটীকায় মন্তব্য করেন, এই সাক্ষাৎ হয়েছিল রবীন্দ্রভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। এ-বিষয়ে তিনি এক ব্যক্তিগত পত্রে (৪.১১.১৯৭০) বর্তমান লেখককে জানান যে ঃ

লালন ফকিরের সম্বন্ধে "পল্লীর রবীন্দ্রনাথের" যে ফুটনোট আছে, তা সত্যি। উপেনবাবু তাঁর "বাংলার বাউল ও বাউলগান" গ্রন্থে ..... বহু গবেষণা করে লিখেছেন যে, "লালনের মৃত্যু ১৯৮০ খৃঃ ১৭ অক্টোবর ১১৬ বছর বয়সে"। রবীন্দ্রনাথ ঐ সময়ে জমিদারীর ভার পাননি; তাই সাক্ষাৎ হয়নি ধরা যেতে পারে। তবে আমার ঐ কাহিনী অসত্য নয়, কারণ যার কাছে শোনা–সে ছেঁউড়েরই বুড়ো– সে বাজে কথা বলার লোক নয়। রবীন্দ্রনাথের স্থানে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হবেন, কারণ ঐ সময়ে জ্যোতিবাবু ঘনঘন শিলাইদহ যেতেন ও থাকতেন। তাঁকেও প্রজারা "বাবুমশাই" বলত।"

শচীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর [লালন] পরিচয় ছিল কিনা তার বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীনেরা বলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এর আলাপ হয়েছিল, কিন্তু সেকথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বসন্তকুমার পালের মহাত্মা লালন ফকির গ্রন্থে 'প্রকাশকের নিবেদনে' অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন উল্লেখ করেছেন ঃ

নিরক্ষর পল্লীবাসী হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা শুনিয়াছি জ্ঞানবৃদ্ধ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত ফকিরের সহিত ধর্ম্মলাপ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। শিলাইদহে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত প্রথম যেদিন তাঁহার ভাবের বিনিময় হয় তাহা জাহ্নবী-যমুনা-মহামিলনের ন্যায় রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গমতীর্থ রচনা করে।

শিলাইদহের সাধককবি গোঁসাই গোপালের (১৮৬৯-১৯১২) সঙ্গীতসংগ্রহ গোপাল গীতাবলীর সঙ্কলক ও প্রকাশক গোপাল-পুত্র রাসবিহারী জোয়ারদারও উল্লেখ করেছেন ঃ

নদীয়া জেলায় কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত শিলাইদহ একটি গ্রাম। ঠাকুরবংশের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পাদস্পর্শে পূত হইয়া গ্রামটির নাম চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। পূত গ্রামটি পবিত্র গঙ্গাসলিলা পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পদ্মার উপর বজরায় থাকিতেন এবং এখানেই তাঁহার কবিত্বশক্তির বিকাশ পায়।... সাধক লালন সাঁই প্রভৃতি বহু সাধু ও দরবেশ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আসিতেন। কবি রবীন্দ্রনাথ সাধক লালন সাঁইকে ভালবাসিতেন ও তাঁহার সুললিত গান একাগ্র মনে শ্রবণ করিতেন।

অন্যত্র মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন 'জনশ্রুতি'র সূত্র ধরে বলেছেন ঃ

কবি রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে লালন ফকীর তাঁহার শিলাইদহস্থ বোটে সাক্ষাৎ করিতে আসেন বলিয়া জনশ্রুতি রহিয়াছে। ..... সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী মহাশয়া লালনকে দেখিয়াছিলেন এবং বোটে তাঁহার গান

শুনিয়াছিলেন

অন্যত্র মনসুরউদ্দীন মন্তব্য করেছেন, "একটা আশ্চর্যের ব্যাপার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালন শাহের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা তার নিশ্চিত কোন খবর পাওয়া যায় না।" আবার পাশাপাশি এ-কথাও বলেছেন ঃ

... জানতে পারা যায় লালন শাহের মৃত্যুর পর শিষ্যসাগরেদের মধ্যে ২/৩ জন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে সাক্ষাৎ করেন। এবং রবীন্দ্রনাথ লালনের মৃত্যুর পর খবর শুনে লালনের শ্রদ্ধাশান্তির জন্যে নগদ দুইশত টাকা দান করেন।

সুকুমার সেন কোনো সূত্র-উল্লেখ না করেই জানিয়েছেন ঃ

সাধনা চালাইবার কালে রবীন্দ্রনাথ উত্তর-মধ্যবঙ্গে লালন ফকির ও আন্দী বৌষ্টমীর মতো অনেক বাউল-বৈষ্ণব-দরবেশের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের গীতিনিষ্ঠ ধর্ম-অনুশীলনের পরিচয় পাইয়াছিলেন।

বিনয় ঘোষও সাক্ষাৎকারের সপক্ষে তাঁর মত পোষণ করেছেন ঃ

১৮৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাউলগানের সংগ্রহটি তাঁর হাতে পড়ার পর যখন বাংলা লোকসাহিত্যের গোপন রত্নভাণ্ডারের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল, তার দু-তিন বছরের মধ্যেই মনে হয়, শিলাইদহে বিখ্যাত বাউল লালন ফকিরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল।

আনোয়ারুল করীম কোনো তথ্য প্রমাণ ব্যতিরেকেই রবীন্দ্র লালন সাক্ষাৎকার সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়ে বলেছেন ঃ

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে বাউলফকির লালন শাহের যে যথেষ্ট হৃদ্যতা এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল আজ তা আর কারো কাছে অবিদিত নয়।.... বৃদ্ধ লালন শাহ তাঁর হৃদয়ের সবটুকু স্নেহ উজাড় করে দিয়েছিলেন এই কবি বন্ধুটির জন্যে।

লক্ষ্য করা যাবে, উপরিউক্ত মন্তব্য-অভিমত সবই কল্পিত, অনুমান কিংবা জনশ্রুতিনির্ভর, কেউই তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে কোনো তথ্যদলিল, উপস্থিত করতে পারেননি।

রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাৎকারের ধারণাটি নানা কারণে অনেকেই সমর্থন করেননি। একে অগ্রাহ্য করার পক্ষে তাঁরা বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রবন্ধে এই সাক্ষাৎ না হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখ করে বলেছেন, "আমার মনে হয় এই কাহিনী সম্পূর্ণ কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।" অন্নদাশঙ্কর রায়ও এ-বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করে মন্তব্য করেছেন, "... দুই জ্যোতিষ্কের সাক্ষাৎকার প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ।"

লালন ফকিরের গানের সঙ্গে আধুনিক মনের সংযোগ আছে, সে - কারণে তিনি রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিলেন;—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে এই মন্তব্য করার সময় বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, 'যদিও তাঁদের দেখাশুনা হয়নি'। সৈয়দ মুর্তাজা আলীর বক্তব্য, "কেউ কেউ লিখেছেন লালন ফকিরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখাশুনা ও আলাপ-আলোচনা হতো। কিন্তু বরীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালন ফকিরের ব্যক্তিগত পরিচয়ের কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।"

বিস্তৃত যৌক্তিক আলোচনা করে সনৎকুমার মিত্রও এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাৎকার হয়নি। চিত্তরঞ্জন দেবও এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারেননি। রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরীও অনুমোদন করেননি সাক্ষাৎকারের কাহিনী।

রবীন্দ্রনাথ-সমীপে পেশকৃত লালনশিষ্য মনিরুদ্দীন শাহের দরখাস্ত থেকেও এই ইঙ্গিত স্পষ্টই পাওয়া যায় যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি,—জ্যোতিরিন্দ্রিনাথ ঠাকুরের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ও যোগাযোগ ছিলো। তিনি লালনের একটি প্রতিকৃতিও অঙ্কন করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছেঁউড়িয়ার আখড়াবাড়ী "লালন সাহা ছাহেবকে নিষ্কর দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু সাহা ছাহেব লোকান্তর হওয়ায় তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইয়াছিল না"। লালনের মৃত্যুর পর লালনশিষ্যদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথও ছেঁউড়িয়ার আখড়াকে নিষ্কর দানে অঙ্গীকার করেছিলেন। লালনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-বিষয়ে পক্ষে বা বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথ কোনোই ইঙ্গিত করেননি এই প্রচলিত ধারণাটি সঠিক নয়। তবে এ-সম্পর্কে তাঁর

বক্তব্য অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন-সংকলিত হারামণির (১ম খণ্ড ঃ কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৩৭) ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত।" লালন ফকির এই নির্বিশেষ 'বাউলদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কিনা সে-সম্পর্কে এখানে স্পষ্ট করে রবীন্দ্রনাথ কিছু বলেননি।

লালনের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরস্পরবিরোধী দুটি মন্তব্য এখানে পেশ করা হলো।

১৯২২ সালে শ্রীনিকেতন পল্লীসেবা বিভাগের গ্রামসেবার কাজের ধারা নির্ধারণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে শান্তিদেব ঘোষের পিতা কালীমোহন ঘোষকে (১৮৮২-১৯৪০) বলেছিলেন ঃ

তুমি তো দেখেছো শিলাইদহতে লালন শাহ ফকিরের শিষ্যগণের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার কিরূপ আলাপ জমত। তারা গরীব। পোষাক-পরিচ্ছদ নাই। দেখলে বোঝবার জো নাই তারা কত মহৎ। কিন্তু কত গভীর বিষয় কত সহজভাবে তারা বলতে পারত।

এই উক্তি থেকে ধারণা জন্মায় যে রবীন্দ্রনাথ লালন নন তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। লালনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকলে এ-ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখই অধিক গুরুত্ববহ ও প্রাসঙ্গিক হতো। আর আলাপ-পরিচয় থাকলে তা গোপনের কোনো কারণ আছে বলেও মনে হয় না—অস্বীকার করারও নেই কোনো যুক্তি।

আবার অপরপক্ষে নীচে বর্ণিত তথ্য থেকে মনে হতে পারে উভয়ের আলাপ-পরিচয় ছিলো। বসন্তকুমার পাল লালনজীবনী রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা প্রার্থনা করে তাঁকে পত্র দেন। কবির পক্ষ থেকে সেই চিঠির জবাব দেন তাঁর একান্ত সচিব সুধীরচন্দ্র কর। ২০ জুলাই ১৯৩৯ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে লিখিত পত্রে বসন্তকুমারকে জানানো হয় ঃ

সবিনয় নিবেদন,

কবি আপনার চিঠি পেয়ে সুখী হয়েছেন। আপনাকে এই মহৎ কাজে

সাহায্য করতে পারলে তিনি আরো সুখী হতেন সন্দেহ নাই। ফকির সাহেবকে তিনি জানতেন বটে কিন্তু সে তো বহুদিন আগে; বুঝতেই পারেন এখন সে সব সুদূর স্মৃতির বিষয় তাঁর মনে তেমন উজ্জ্বল নয়। তবে তিনি বললেন, কলকাতায়, "লালবাংলা", ২০ নং মে ফেয়ার, বালিগঞ্জ—এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায় থাকেন, তিনিও ফকির সাহেবকে জানতেন, তাঁর কাছে খোঁজ করলে অনেক বিষয় আপনার জানবার সুবিধা হোতে পারে।

'ফকির সাহেবকে [লালন] তিনি [রবীন্দ্রনাথ] জানতেন—এই উক্তিটি অবশ্য উভয়ের আলাপ-পরিচয়ের ধারণাকে সমর্থন করে।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে জমিদারীর দায়িত্বভার নিয়ে আসেন ১৮৯০ সালের শেষদিকে, ততোদিনে লালনের মৃত্যু (১৭ অক্টোবর ১৮৯০) হয়েছে। তাই এইসময়ে দেখা হওয়া সম্ভব নয়। তবে জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে বাল্যকাল থেকেই বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার শিলাইদহে এসেছেন। সেই সময়ে লালন ফকিরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব ছিলো না। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে স্থির সিদ্ধান্তে আসার পক্ষে সুস্পষ্ট তথ্য প্রমাণের একান্তই অভাব। হারামণির ভূমিকায় বাউলদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে কারো নামোল্লেখ করেননি তিনি। ফ্রান্সে প্রদত্ত 'An Indian Folk Religion' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বাউলকবি গগন হরকরা বা বৈষ্ণবসাধিকা সর্বক্ষেপীর নামোল্লেখ করে তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ের কথা বললেও লালন সেখানে অনুপস্থিত।

তবে এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, লালনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হোক আর নাই হোক, লালনের গান রবীন্দ্রমানসে যে দূরপ্রসারী প্রভাব ও প্রেরণা বিস্তার করেছিল, সে সম্পর্কে দ্বিমত বা বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই।

রবীন্দ্রনাথের লালনচর্চা

জমিদারী পরিচালনার সূত্রে শিলাইদহে এসে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বাউল-ফকির ও বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর সংস্পর্শে আসেন। এখানেই বাউলগানের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে। এই শিলাইদহেই চলমান বাউলজীবনের মরমী

অন্বেষণকে তিনি অনুভব করেছেন, হৃদয় দিয়ে, চিত্রিত করেছেন তাকে কবিতায় ঃ

কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারা-হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার গভীর নির্জন পথে।

শিলাইদহে গগন হরকরা, কাঙাল হরিনাথ, গোঁসাই রামলাল, গোপাল, সর্বক্ষেপী বোষ্টমী ও লালনের শিষ্যসম্প্রদায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এঁদের নিকটেই তিনি লালনের গান বিশেষভাবে শোনার সুযোগ লাভ করেন। লালনফকির ও গগন হরকরার গান তিনি সুধীসমাজে প্রচার করেন।

বাঙালীসমাজে লালন সম্পর্কে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ সঞ্চারের জন্য রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মরমীসাধকের পরিচয়ের পরিধি প্রসারে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।১০৭ রবীন্দ্রনাথ প্রথম লালনের গানের উল্লেখ করে ভাদ্র-১৩১৪ সালের প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁর গোরা উপন্যাসে ঃ

আলখাল্লা-পরা একটি বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল ঃ

খাঁচার ভিতর অচিন-পাখি কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

গোরা উপন্যাসের বিনয়ের আলস্যবশত বাউলকে ডেকে এই গানটি লিখে নেয়া হলো না, কিন্তু "এ অচেনা পাখির সুরটা মনের মধ্যে গুন গুন করিতে লাগিল।"

এই একই গানের উল্লেখ মেলে জীবনস্মৃতি (১৩১৯) গ্রন্থের 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' অধ্যায়ে। প্রথম দু'টি পংক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন ঃ

দেখিলাম, বাউলের গানও ঠিক ওই একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা

বলিয়া যায়; মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পারে না। এই অচিত পাখির যাওয়া-আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে।

১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশনে 'The Philosophy of Our People' শীর্ষক সভাপতির ভাষণে তিনি 'অচিন পাখি'র এই গানের উল্লেখ করেন। লালনের এই গানটির সঙ্গে তিনি ইংরেজ কবি শেশীর কবিতার তুলনা করে শিরোপা দিয়েছিলেন বাঙলার মরমী কবিকেই ঃ

That this Unknown is the profoudest reality, though difficult of comprehension, is equally admitted by the English poet as by the nameless village singer of Bengal, in whose music vibrate the wing-beats of the unknown bird,-only Shelley's utterance is for the cultrual few, while the Baul Song is for the tillers of the soil, for the simple folk of our village households, who are never bored by its mystic transcendentalism.

এরপর ১৩৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত 'ছন্দের প্রকৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে, যা পরে 'ছন্দ' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়, রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের দুটি সম্পূর্ণ গান ও একটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে এর ছন্দ-সুষমা সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য করেন। বলেছেন তিনি ঃ

প্রাকৃত-বাংলার দুয়োরানীকে যারা সুয়োরানীর অপ্রতিহতভাবে সাহিত্যের গোয়ালঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে সেই 'অশিক্ষিত'-লাঞ্ছনাধারীর দল যথার্থ বাংলাভাষার সম্পদ নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায়না। তাদের প্রাণের গভীর কথা তাদের পাণের সহজ ভাষায় উদ্ধৃত করে দিই।

আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
সে কি আর জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।...
আর-একটি

এমন মানব-জনম আর কি হবে।
যা কর মন ত্বরায় কর
এই ভবে।...

এই ছন্দের ভঙ্গি একঘেঁয়ে নয়। ছোটো-বড়ো নানাভাবে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধুপ্রসাধনে মেজেঘষে শোভা বাড়ানো চলে, আশাকরি এমন কথা বলবার সাহস হবেনা কারো।

এই একই প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি 'বাঙালির দিনরাত্রির ভাষা'র নিদর্শন হিসেবে লালনের 'কোথা আছেরে দীন দরদী সাঁই' এই গানটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেন।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত 'ছাত্রসভা'র এক অধিবেশনে (১৩১৬) প্রদত্ত ভাষণে প্রসঙ্গক্রমে লালনের উল্লেখ করেছিলেন। এখানে তিনি লালন সম্পর্কে 'কিছু জানি' বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, "লালন ফকির কুষ্টিয়ার নিকটে হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন—এরূপ শোনা যায় যে তাঁহার বাপ মা তীর্থযাত্রাকালে পথিমধ্যে তাঁহার বসন্তরোগ হওয়াতে তাঁহাকে রাস্তায় ফেলিয়া চলিয়া যান। সেই সময় একজন মুসলমান ফকির দ্বারা তিনি পালিত ও দীক্ষিত হন। এই লালন ফকিরের মতে মুসলমান হিন্দু জৈন মত-সকল একত্র করিয়া এমন একটি জিনিষ তৈয়ার হইয়াছে যাহাতে চিন্তা করিবার অনেক বিষয় হইয়াছে। এ বিষয়ে সকলেরই মন দেওয়া উচিত।" [বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), পৌষ ১৩১৬]।

পারিবারিক-সূত্রে রবীন্দ্রনাথ লালন সাঁইর কথা প্রথমে জেনেছিলেন বলে অনুমান করা চলে। শিলাইদহে জমিদারীর কার্যভার গ্রহণের পর লালনের গানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। শিলাইদহেরই মরমী কবি গগন হরকরার নিকটে তিনি লালনের গান শোনেন। লালন শিষ্যদের সাহচর্যও তাঁকে লালনের গান শোনার সুযোগ করে দেয়। লালনের গানের সহজ-সরল সুর ও উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা তাঁকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে।

শিলাইদহে অবস্থানকালেই তিনি লালনের গান সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর জবানী থেকে জানা যায়, "বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি

বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি।" কথিত আছে, তিনি ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে লালনের গানের খাতা আনিয়ে ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে ২৯৮টি গান নকল করিয়ে নেন। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী এক পত্রে (৩০.৯.১৯৭০) বর্তমান লেখককে জানিয়েছিলেন ঃ

লালন ফকিরের খেরোবাঁধা গানের খাতা চেয়ে নিয়ে কবি কতকগুলো গান নির্বাচিত করে পৃথক একখানা খাতায় ঐ রসিক বামাচরণবাবুকেই নকল করতে দেন। ঐ খাতাখানি শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্রভবনে' সংরক্ষিত আছে। আমি সেটা দেখেছি এবং বাউলসঙ্গীত ও ধর্মের গবেষক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে দেখিয়েছি।

কিন্তু এই খাতা সম্পর্কে সনৎকুমার মিত্র অনুমান করেছেন ঃ

"... রবীন্দ্র-ভবনের খাতা দুটিই ছেঁউড়িয়ার আশ্রমের আসল খাতা এবং যেভাবেই হোক তা 'রবিবাবু মশায়ে'র হাতে পৌঁছানোর পর আখড়ায় আর ফিরে আসেনি।"

সনৎকুমার মিত্রের এই অনুমান যে সঠিক সে-বিষয়ে আমরা যখন নিঃসংশয়। রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের গানের খাতার হস্তাক্ষর ও বর্তমান লেখক-সংগৃহীত জনৈক লালনশিক্ষা কর্তৃক লিপিকৃত লালনগীতির সূচীপত্রের (দ্র. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত লালন স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ১২৮ এবং অন্নদাশঙ্কর রায়ের গ্রন্থ লালন ও তাঁর গান, পৃ. ১৫) হস্তাক্ষর অভিন্ন। লালনশিষ্যরাও বারবার বলেছেন রবীন্দ্রনাথ লালনের গানের খাতা নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেননি। লালনগীতির সংগ্রাহক মতিলাল দাশকে লালন-শিষ্য ভোলাই শাহ বলেছিলেন ঃ

দেখুন, রবিঠাকুর আমার গুরুর গান খুব ভালবাসিতেন, আমাদের খাতা তিনি লইয়া গিয়াছেন, সে খাতা আর পাই নাই, কলিকাতা ও বোলপুরে চিঠি দিয়াও কোনও উত্তর পাই নাই।

এই একই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, "আশ্রমের কর্তৃপক্ষেরা বলে যে, সাঁইজীর আসল খাতা শিলাইদহের 'রবিবাবু মশায়' লইয়া গিয়াছেন।" অন্নদাশঙ্কর রায় যখন কুষ্টিয়ার মহকুমা প্রশাসক তখন

তিনিও লালনের গানের 'আসল পুথিখানি' 'কবিগুরার কাছ থেকে উদ্ধার করতে সাহায্য' করার জন্য কাঙাল হরিনাথের ভ্রাতুস্পুত্র ও লালন-অনুরাগী ভোলানাথ মজুমদার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হন। অতএব এই সিদ্ধান্তই সমীচীন ও সঙ্গত যে রবীন্দ্রনাথ ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে লালনের মূল খাতাই সংগ্রহ করেছিলেন যা এখন 'রবীন্দ্র-ভবনে' সংরক্ষিত আছে। বামাচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লালনের গান নকল করালেও সেই খাতার সন্ধান এখানো মেলেনি।

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ তারিখ বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের তৎকালীন আধিকারিক ডক্টর পশুপতি শাশমল বর্তমান লেখককে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত লালন-পাণ্ডুলিপির কয়েক পৃষ্ঠার আলোকচিত্র এবং পাণ্ডুলিপির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রেরণ করেন। উক্ত বিবরণটি নিম্নরূপ ঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট থেকে প্রাপ্ত রবীন্দ্রভবনস্থ পাণ্ডুলিপির মধ্যে লালন ফকিরের গানের খাতা দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের পরিগ্রহণ সংখ্যা ঃ ১৩৮ (এ)-১ এবং ১৩৮ (এ)-২। দুটি খাতারই আখ্যাপত্রে পেন্সিলে লেখা পাওয়া যায় ঃ Songs of Lalan Fakir-Collected by Rabindranath.

খাতার পিছন দিক থেকে লেখা শুরু হয়েছে, অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে শেষ পৃষ্ঠাকে (বাঁ দিকের পৃষ্ঠা) আখ্যাপত্র করা হয়েছে। সাদা কাগজে পেন্সিল দিয়ে লাইন টেনে বেশ স্পষ্ট হস্তাক্ষর কালিতে গানগুলি লেখা। লাল পেন্সিলে পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া আছে। লিখিত পৃষ্ঠার সংখ্যা সর্বমোট ১৬৩ (১ম খাতা-৬৮; ২য় খাতা-৯৫) মোট গানের সংখ্যা ২৯৮। দুটি খাতার আয়তন ১৭ সেঃ মিঃ × ২১ সেঃ মিঃ।

প্রথম খাতায় ১২৬ ও দ্বিতীয় খাতায় ১৭২টি গান সংকলিত হয়েছে। ৮টি গান দু'বার লিখিত, সেই হিসেবে গানের প্রকৃত সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯০। সনৎকুমার মিত্রের হিসেবে "রবীন্দ্রভবনে'র রক্ষিত দুটি খাতায় গানের সংখ্যা ২৯৭, এরমধ্যে ১২টি গানের পুনরাবৃত্তি ঘটায় গানের প্রকৃত সংখ্যা ২৮৫।

'রবীন্দ্রভবনে' রক্ষিত লালনের গানের খাতায় রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি

ক্ষেত্রে স্বহস্তে সংশোধন করেছেন। প্রথম খাতার কোনো গান তিনি সংশোধন না করলেও 'দ্বিতীয় খাতায় ১০৪, ১০৬ ১২১ সংখ্যক গান তিনটিতে পাঁচটি জায়গায় কয়েকটি শব্দ কবি স্বহস্তে কেটে তার মাথায় শুদ্ধ পাঠ লিখে রেখেছেন। রবীন্দ্র-সংগৃহীত লালনের গানের একটি বর্ণনানুক্রমিক সূচী প্রকাশ করেন চিত্তরঞ্জন দেব (পরিচয়, চৈত্র ১৩৬৪)। এই সংগ্রহের আলোকচিত্র প্রতিলিপি প্রথম মুদ্রিত হয় আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত লালন স্মারকগ্রন্থে (ঢাকা, চৈত্র ১৪৮০)। রবীন্দ্র-সংগৃহীত এই গানের খাতা থেকে সনৎকুমার মিত্র মূল বানানের অশুদ্ধ রূপ অবিকৃত রেখে হুবহু ২৮৫টি গান প্রকাশ করেন তাঁর লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য (কলিকাতা ১৩৮৬) গ্রন্থে।

প্রবাসী পত্রিকায় ১৩২২ সালের বৈশাখ মাস থেকে লোকসঙ্গীত প্রকাশের জন্য 'হারামণি' নামে একটি নতুন বিভাগ প্রবর্তিত হয়। সূচনাতেই প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্র-সংগৃহীত গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে' এই গানটি। ১৩২২ সালের আশ্বিন থেকে মাঘ পর্যন্ত চার কিস্তিতে রবীন্দ্র-সংগৃহীত লালনের মোট কুড়িটি গান প্রকাশিত হয়। এই কুড়িটি গানের মধ্যে মাত্র আটটি গান 'রবীন্দ্রভবনে' রক্ষিত খাতা থেকে গৃহীত। এ-থেকে ধারণা হয় রবীন্দ্রনাথ অন্য সূত্র অর্থাৎ ভিন্ন খাতা, লালনশিষ্য কিংবা শিলাইদহের বাউলদের নিকট থেকেও লালনের গান সংগ্রহ করেছিলেন।

রবীন্দ্রমানসে লালন-প্রভাব

বাউলের গানের সুর ও বাণী, তত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। এইসব গান তাঁর চিত্ত ও শিল্পলোক উভয়কেই প্রভাবিত করেছে। বলেছেন তিনি ঃ

... বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি।

... আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিনীর সঙ্গে আমরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে

বাউলসুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন একসময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হ'য়ে মিশে গেছে।

অন্যত্র তিনি উল্লেখ কছেন, "আমার অনেক গান বাউলের ছাঁচের, কিন্তু জাল করতে চেষ্টাও করিনি, সেগুলো স্পষ্টত রবীন্দ্রবাউলের রচনা।" বাউলভাবনার সপক্ষে তাঁর এই মানস-রূপান্তরে লালনের প্রভাব গভীর ও প্রত্যক্ষ।

লালনের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়' রবীন্দ্রনাথের ভাবজগতের পরিচালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এই গানটি তাঁর জীবনচেতনার প্রেরণা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। সুকুমার সেন যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'বাউলগানের এই ... পদটি কবিচিত্তে দীক্ষাবীজ বপন করিয়াছিল।" এ-বিষয়ে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, "... লালন ফকিরের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়' এই জিজ্ঞাসার সহিত রবীন্দ্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসার গভীর মিল ছিল..."

লালনের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও মনোযোগ যে কতো গভীর ছিলো, তাঁর পাঠ্যতালিকায় লালন যে কতোখানি গুরুত্ব অর্জন করেছিলেন সে সম্পর্কে জানা যায় ঃ

'বেদ-উপনিষদ' থেকে 'বাইবেল ও লালন শাহের জীবনী সর্বদা তাঁর টেবিলে থাকত।

বাউলতত্ত্ব ও দর্শন, যা লালনে এসে সংহত ও একটি পূর্ণরূপে লাল করেছি, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাউলগান, বিশেষ করে লালনের গান রবীন্দ্রমানসে যেমন তাঁর সঙ্গীতেও তেমনি স্পষ্ট ছাপ ফেলেছে—প্রেরণা হয়েছে অনেক কবিতার। রবীন্দ্রনাথে গানে লালনগীতির কথা ও সুরের প্রভাব ও সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়। লালন একটি গানে বলেছেন ঃ

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে।
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব চক্ষেতে ॥

সেই একই আর্তি ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের গানে ঃ

ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে

ও বন্ধু আমার!
না পেয়ে তোমার দেখা, একা একা দিন যে আমার কাটে না রে॥

এই গানটি লালনের গানের পরিপূরক বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। একজনের উচ্চারণ, তাঁর দেহঘরের মুক্তিচাবি অপরের হাতে, অপরজন, সেই মুক্তিদাতাকে আহবান করছেন সখারূপে।

দেহবিচারই বাউলসাধনার মূল বিষয়। আপন দেহঘরে যে পরম-পুরুষের বাস, তাঁকে না চিনলে সাধনাসিদ্ধি হয় না। লালন ফকির তাই বলেছেন ঃ

আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে।
আমি জনম–ভর একদিন দেখলাম না রে ॥
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে
দেখতে পাইনে এই নয়নে
হাতের কাছে যার ভাবের হাটবাজার
আমি ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে॥

পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে দেখতে আমি পাইনি
তোমায় দেখতে আমি পাইনি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয়-পানে চাইনি॥

নিজেকে জানতে-চিনতে পারলেই 'অচিন মানুষে'র সন্ধান পাওয়া যায়। এই আত্ম-অন্বেষণের মধ্যে নিহিত রয়েছে সকল পরিচয়ের কথা। লালন বলেন ঃ

যার আপন খবর আপনার হয় না।
আপনারে আপনি চিনতে পারলে
যাবে সেই অচিনারে চিনা ॥

রবীন্দ্রনাথ বাউলের এই বাণীকেই বুকের মধ্যে লালন করে গেয়েছেন ঃ

আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা ॥

লালনের অন্তিম মুহূর্তে রচিত 'পার করো হে দায়লচাঁদ আমারে' এই

গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষপ্রান্তে রচিত গান 'সমুখে শান্তিপারাবার ভাসাও তরুণী হে কর্ণধারে'র ভাবগত আত্মিক মিল লক্ষণীয়।

এ-ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আরো কিছু বাউলাঙ্গের গান আছে যাতে লালনের গানের ভাব-ভাষা-ভাবনার আভাস চোখ এড়িয়ে যায় না। যেমন ঃ

১ খ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়। (লালন)
খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে। (রবীন্দ্রনাথ)

২ আছে যার মনের মানুষ মনে, সে কি জপে মালা। (লালন)
সে যে মনের মানুষ, কেন তারে বসিয়ে রাখিস নয়নদ্বারে? (রবীন্দ্রনাথ)

৩ আমার মনের মানুষেরি সনে মিলন হবে কতদিনে। (লালন)
আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে। (রবীন্দ্রনাথ)

৪ ঐ এক অজান মানুষ ফিরছে দেশে ... (লালন)
সে যে বাহির হল আমি জানি (রবীন্দ্রনাথ)

৫ আমারে কি রাখবেন গুরু চরণদাসী/ ইতরপানা কার্য আমার অহর্নিশি ॥ (লালন)
আমি কেবল তোমার দাসী। কেমন করে আনব মুখে তোমায় ভালবাসি ॥ (রবীন্দ্রনাথ)

৬. কারে বলবো আমার মনের বেদনা/এমন ব্যথায় ব্যথিত মেলেনা ॥ (লালন)
আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল নাকেহ। (রবীন্দ্রনাথ)

৭. কেন কাছের মানুষ ডাকছো শোর করে।/আছিস তুই যেখানে, সেও সেখানে খুঁজে বেড়াও করে ॥ (লালন)
আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,/তাই হেরি তায় সকলখানে ॥ (রবীন্দ্রনাথ)

এমনি করে আরো উদাহরণ পেশ করা যায়। সে-সব গানের বিশেষ বিশেষ শব্দ, রূপক, প্রতীক, উপমা, চিত্রকল্প, ভাব ও সুর কখনো আংশিক আবার কখনো বা পরোক্ষ উপায়ে বাউল বা লালনের গান থেকে গৃহীত।

উপরের গানগুলো বিচার করলেই বোঝা যায় লালনের গান রবীন্দ্রনাথকে কতোখানি আকৃষ্ট করেছিল—কীভাবে প্রভাবিত করেছিল। সাহিত্য সম্পর্কে ধারণাহীন নিরক্ষর লালনশিষ্যরা "কবিগুরুকে লালনের চেলা বলিয়া মনে করে এবং বলে যে, কবিগুরু লালনের গানকে রূপান্তরিত করিয়াই জগৎ-জোড়া নাম কিনিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথের নাটকেও বাউলভাবনার অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলে। তাঁর রূপক বা সাংকেতিক নাটকের প্রায় প্রত্যেকটিতেই তিনি বাউল-চরিত্র সংযোজন করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি নাটকে লালনীয় প্রভাবে বাউলের তত্ত্বদর্শনের সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। জানা যায় ঃ

....বাউলতত্ত্বের উপর তিনি যে যুগের তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা করেছিলেন, তাঁর নাম 'রাজা' বৌদ্ধ আখ্যান থেকে তিনি 'রাজা' নাটকের কাহিনী গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বাংলার বাউলের ভাবটি তার উপর আরোপ ক'রে নিয়ে তাঁকে অনবদ্য সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলেছেন। একটি বাউলগানে আছে, 'সে যে কথা কয় দেখা দেয় না'; এই ভাবটিকেই তিনি বৌদ্ধ আখ্যায়িকাটির ভিতর দিয়ে প্রকাশ ক'রে তার মধ্য দিয়ে নিজের অধ্যাত্ম ধ্যান ধারণার পরিচয় প্রকাশ করেছেন।

'কে কথা কয় রে দেখা দেয় না'—লালনের এই প্রাতিস্বিক গানের ভাব-সত্যকে তিনি তাঁর রাজা নাটকে রূপায়িত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শক্তিমান, সচেতন, অসামান্য এক শিল্পী-পুরুষ। তাই তিনি লালনের বাণী ও সুরকে ভেঙে। 'আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে' নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন, যে একান্তই রবীন্দ্রবাউলের রচনা। রবীন্দ্রনাথের মরমী-মানসে লালন ছিলেন প্রেরণার এক স্বতঃস্ফূর্ত উৎস। কালজয়ী এই দুই গীত-প্রতিভা সম্পর্কে এ-কথা হয়তো বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ নিরক্ষর হলে লালন ফকিরের মতো মরমী কবি হতেন, আর লালনশাহ শিক্ষিত হলে হতেন রবীন্দ্রনাথের মতো বিদগ্ধ কবি।